ভদ্রলোক

তারাপদ রায়

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুখবন্ধ

সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় 'কাণ্ডজ্ঞান' ধারাবাহিক শুরু করার বহু আগে সেই নিতান্ত সরস প্রথম যৌবনে অধুনা অদৃশ্য 'অমৃত' পত্রিকায় নক্ষত্র রায় নামে সপ্তাহে সপ্তাহে 'অদ্বিতীয়' লিখেছিলাম। অনেক পরে স্বনামে 'কথায় কথায়' বছর খানেক লিখেছিলাম সেখানে। তারই কিছু এবং পাশাপাশি আনন্দবাজার, যুগান্তর, বর্তমান, আজকাল, কথাসাহিত্য এবং অন্যত্র এ যাবৎ যা কিছু রম্যরচনা লিখেছি তারই থেকে বেছে নিয়ে এই বই।

*　　　*　　　*

একই নদীর জলে যেমন দু'বার স্নান করা যায় না, তেমনিই একই রসিকতা দু'বার করা যায় না। একই গল্প একই লোকের মুখে দু'বার দু'রকম হয়ে যায়। একই লেখনীতে অন্যভাবে ফিরে আসে একই আখ্যান একেবারে আলাদা হয়ে। এই আখ্যানমালার কোনো কোনো খণ্ডকাহিনী যদি কোনো স্মৃতিমতী পাঠিকার চেনা চেনা মনে হয় তাই এই অজুহাত দিয়ে রাখলাম।

বিনয়াবণত

তারাপদ রায়

উৎসর্গ

তারা—উত্তরা এবং

উত্তরোত্তর সঞ্জিৎকে

এই লেখকের :

তোমার প্রতিমা
ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন
কোথায় যাচ্ছেন তারাপদ বাবু
নীল দিগন্তে প্রথম ম্যাজিক
পাতা ও পাখিদের আলোচনা
ভালোবাসার কবিতা
দারিদ্র্যরেখা
শ্রেষ্ঠ কবিতা (যন্ত্রস্থ)
ডোডোতাতাই
আবার ডোডোতাতাই
ডোডোতাতাইয়ের জন্যে
ডোডোতাতাই পালাকাহিনী
হাতে হাতে ডোডোতাতাই
একটি কুকুরের উপাখ্যান
কাণ্ডজ্ঞান
বিদ্যাবুদ্ধি
জ্ঞানগম্যি
যত্তসব
মেলামেশা
খদ্দের
শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প
বিদ্যাপতির পদাবলী
খাঁচাছাড়া
রস ও রমণী
Where to Tarapada Babu
Santal Rebellion

সূচীপত্র

ভদ্রলোক

আসল ভদ্রতা হলো মুখ না খুলে হাই তুলতে পারা। এত দামি কথা, সবাই বুঝতে পারছেন, মোটেই আমার নয়। এক ফাজিল মনীষী এই উক্তি করেছিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা অসম্ভব। মুখ না খুলে হাই তোলা যায় না। কেউ পারবে না। তবু চূড়ান্ত এটিকেটের সেটাই নাকি নিদর্শন।

অবশ্য এটিকেট ঠিক ভদ্রতা নয়। সেটা একটা অন্য জিনিস, পুরোপুরি বিলিতি ব্যাপার। ভরা গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় দুঃসহ লোড-শেডিংয়ের গরমে নিজের বাসায় অন্য লোকের সামনে জামা গায়ে দিয়ে বসে থাকা, নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভরপেট না খাওয়া, সামনে সুস্বাদু খাবার থাকা সত্ত্বেও এবং হঠাৎ কখনো ভরপেট খেয়ে ফেললে ঢেকুর না তোলা—এই সব হলো এটিকেট, যে-শব্দের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই, ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে বিলিতি ভদ্রতা।

ভদ্রতার কথা পরে হবে। আগে ভদ্রলোকের কথা বলি। এটিকেটগ্রস্ত ভদ্রলোকের কথা।

ভদ্রলোকের সমস্যা অনেক। তাকে পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরতে হয়, জুতো পায়ে দিতে হয়, হোটেল-রেস্তোরায় কেউ খাবার দিলে তাকে টাকা দিতে হয় অন্যদের আপত্তি সত্ত্বেও। সে বাসে উঠলে চেনা লোকের মুখোমুখি হলে তার টিকিট নিজের সঙ্গে কাটে, সে সবার আগে সিট থেকে উঠে মহিলা বা বৃদ্ধ-যাত্রীকে জায়গা ছেড়ে দেয়।

প্রিয় পাঠিকা, আপনার কি এই ভদ্রলোককে বেশ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে? তবে অনেক দিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে—তাই নয়? এই ভদ্রলোককে আমি শেষবার দেখেছিলাম এক অগ্নিকাণ্ডের রাত্রিতে।

আমাদের পাশের গলিতে একটা পুরনো দোতলা বাড়িতে আগুন

লেগেছিলো। যতটা আগুন তার চেয়ে ধোঁয়া অনেক বেশি। বাড়ির পিছনে একটা খড় কাটার কল ছিলো একটা খাটালের পাশে। ভেজা খড়ে আগুন লেগে ধোঁয়া বের হচ্ছিল ফলে চরাচর অন্ধকার।

ধোঁয়ার আশে-পাশে দু-একটি লেলিহান শিখা। আমরা দৌড়ে, গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেই বাড়ির সামনে, নিরুপায় দর্শক। তবে একটা সান্ত্বনা ছিলো যে বাড়ির সবাই অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

কিন্তু একটু পরে শোনা গেলো সান্ত্বনাটা সঠিক নয়। দোতলার উপরে একটা চিলেকোঠা ঘর আছে, সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলা থাকেন, বাড়িওলার পিসিমা তিনি, গোলমালে নেমে আসতে পারেননি। বাড়ির যে পাশটায় আগুন লেগেছে তার অন্যপাশে ছাদ থেকে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি রয়েছে। সেই সিঁড়ির দিকে আগুন এখনো যায়নি, যদিও বেশ ধোঁয়া রয়েছে। বৃদ্ধ মহিলার পক্ষে সেই ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে এই ধোঁয়ার অন্ধকারের মধ্যে নেমে আসা অসম্ভব।

কি করা যায়, দমকল কখন আসবে, এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলাম আমাদের মধ্য থেকে সেই ভদ্রলোক নাক পর্যন্ত মুখ রুমালে ঢেকে দ্রুত লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন এবং অল্প পরেই তিনি ভদ্রমহিলাকে টেনে নিয়ে লোহার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে আসতে আসতে আচমকা ভদ্রলোক একটা হোঁচট খেয়ে সিঁড়ি টপকিয়ে নিচে পড়ে গেলেন। তখন অবশ্য মাত্র চার পাঁচ ধাপ বাকি ছিলো। বৃদ্ধা মহিলা সামলে নিয়েছিলেন। তিনি সিঁড়ির পাশের একটা লোহার রেলিং আঁকড়িয়ে কোনো রকমে ধাক্কা বাঁচালেন। অন্য একজন দৌড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলাকে নামিয়ে নিয়ে এলো।

আমরা ততক্ষণে ছুটে গিয়ে ভূপতিত ভদ্রলোককে তুললাম। আমাদের কিছু করতে হলো না, তিনি নিজেই উঠলেন। বিশেষ চোট লাগেনি।

আমরা তখন তাঁর গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তাঁর সাহসের গুণগান করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি একবাক্যে আমাদের থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'সাহসী কাহসী যাই বলুন এটা কি ভদ্রলোকের কাজ করলাম, ভদ্রমহিলার আগে নেমে এলাম। তাঁর পা হড়কিয়ে নিচে পড়ে যাওয়ার

ব্যাপারে আমরা যাতে সহানুভূতি না দেখাই তাই তিনি ঘুরিয়ে এ কথাটা বললেন, সেটা আমরা বুঝলাম এবং বুঝতে পারলাম যে তিনি ভদ্রলোক।

অন্য এক ভদ্রলোকের গল্প বলি। একটা পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে তিনি দেখলেন দোকানের পাশে কোথাও সিগারেটের আগুন ধরানোর জন্যে জ্বলন্ত দড়ি নেই। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'না দড়ি রাখি না।'

তখন ভদ্রলোক দোকানদারকে বললেন, 'তা হলে দেশলাইটা দিন।' দোকানী গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন। তারপর দ্বিতীয়বার চাইতে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'দেশলাই নেই।'

এবার ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা সিকি বার করে বললেন, 'আমাকে একটা নতুন দেশলাই দিন।' সিকির বিনিময়ে দোকানদার নির্বিকারভাবে একটা দেশলাই ভদ্রলোককে দিলেন।

তখন ভদ্রলোক সেই দেশলাই খুলে একটা কাঠি বার করে জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরালেন। তারপর দেশলাইটা হতবাক দোকানদারকে দিয়ে বললেন, 'এটা রেখে দিন। এরপর আমার মত কোনো ভদ্রলোক যদি সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই চায় তাঁকে দেবেন দেশলাইটা।'

ভদ্রলোকের কাহিনী ভদ্রমহিলাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। এর পরের আখ্যানে দুজন ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক আছে।

এক তন্বী যুবতী ট্রামে যাচ্ছিলেন। তন্বী বললে কম বলা হয়, তিনি রীতিমত রোগা। তখন সকাল সাতটা, সাড়ে সাতটা। ট্রামে-বাসে তেমন ভিড় শুরু হওয়ার সময় হয়নি। ডিপোয় উঠে একটা লম্বা সিটে যুবতী একাই বসেছিলেন। একটু পরে লোক উঠতে লাগলো, দুই বিশালবপু ভদ্রলোক যথাসময়ে যুবতীর দুই পাশে বসলেন। তাঁদের দেহের চাপে যুবতীর বেশ অস্বস্তি হচ্ছিলো, একদম কুঁকড়ে গিয়েছিলেন তিনি।

হঠাৎ মুশকিল আসান হলো। এক আধ-চেনা স্থূলকায়া মহিলা, শহরতলীর কোন একটা বিদ্যালয়ের প্রধানাশিক্ষিকা, তিনি এই সময়ে ট্রামে উঠেছেন।

প্রধানাশিক্ষিকাকে দেখে যুবতী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দিদি এখানে আসুন, আমার সিটে বসুন।' যুবতী উঠে দাঁড়াতে সামান্য যে ফাঁকটুকু তিনি কায়ক্লেশে দখল করে আসীন ছিলেন সেটুকু বুজে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

প্রধানা শিক্ষিকা সেই অপসৃয়মান বসার জায়গার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসবো নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি এই দুই ভদ্রলোকের মধ্যে কার কোলে বসেছিলে এতক্ষণ, সেটা বলে দাও।'

অবশেষে ভদ্রতার প্রশ্নে অল্প বয়সের একটা দুঃখের কথা মনে পড়ছে।

সাল ১৯৫০। স্থান টাঙ্গাইল টাউন, সদর রাস্তা (কোনো অজ্ঞাত কারণ যার নাম ভিক্টোরিয়া রোড)। সময় খারাপ। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর সবচেয়ে খারাপ সময়।

আমি ইস্কুলের উঁচু ক্লাশে পড়ি, কৈশোর প্রায় শেষ। সদর রাস্তা দিয়ে আপনমনে যাচ্ছি। উল্টো দিক থেকে আসছে মাছের বাজারের প্রাক্তন নিকারি বর্তমানে আনসার এ্যাডজুটান্ট আসগর মিঞা। তাকে দেখেছিলাম, কিন্তু খেয়াল করিনি। খেয়াল করার বয়েস সেটা নয়।

কিন্তু আসগর নিকারি খেয়াল করেছিলো। তখন তার আঙুল ফুলে কলাগাছ, তখন তার পুঁটিমাছ ফুলে রুইমাছ।

আসগর নিকারি রাস্তায় আমাকে ধরলো এবং সগর্জনে জানতে চাইলো তাকে আদাব না দিয়ে আমি কোন্ সাহসে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি, আমার মতো বেয়াদপ, বেতমিজেরা পাকিস্তানের শত্রু।

এই সব কটুবাক্য বলে আসগর নিকারি আমাকে নির্দেশ দিলো তাকে দুশোবার আদাব জানাতে। আমার বেয়াদপির সেটাই সাজা।

আমাকে রক্ষা করলেন স্থানীয় মুসলিম লীগের কর্মকর্তা সফিউল্লা সাহেব। তাঁরও তখন খুব রমরমা, কিন্তু তাঁর চক্ষুলজ্জা ছিলো, এতদিন পরে মনে হয় তিনি ভদ্রলোকও ছিলেন।

সেই ডামাডোলের বাজারেও মুসলিম লীগ কর্তা সফিউল্লা সাহেবকে আসগর নিকারি রীতিমত সমীহ করতো।

সফিউল্লা সাহেব আমার দুর্গতি দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আসগর যখন আমাকে দুশোবার আদাব দেবার নির্দেশ দিলো,

তিনি ব্যাপারটায় মাথা গলালেন। আসগরকে বললেন, 'ও যদি তুশোবার তোমাকে আদাব দেয় তোমাকেও সঙ্গে সঙ্গে তুশোবারই আদাব ফেরত দিতে হবে, আদাবের সহবত মানতে হবে।

এরপরে সেদিন নিকারি নিরস্ত হয়েছিল। একজন কিশোরের পক্ষে তুশোবার কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব অভিবাদন জানানো তেমন তুঃসহ হয়তো নয়, কিন্তু প্রৌঢ় আগরের সহবত মেনে সেটা ফিরিয়ে দিতে জিব বেরিয়ে যেতো।

এই 'সহবত' শব্দটা আজকাল শুনি না। আগে শুনতাম এ লোকটা সহবত জানে না, ও বাড়ির ছেলেদের সহবত খুব ভালো। শব্দটার সঠিক মানে জানি না। তবে অনুমান করতে পারি সহবতই ইংরেজিতে এটিকেট।

মনে সন্দেহ হওয়াতে অভিধানের পাতা খুলে দেখছি সহবত শব্দের মানে হলো 'সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা।' শব্দটি বাংলায় এসেছে নবাবী আমলে আরবী শব্দ সেহিবৎ থেকে।

অপরদিকে এটিকেট শব্দটি ইংরেজিতে এসেছে ফরাসী ভাষা থেকে, ফরাসী আর ইংরেজিতে শব্দটির একই বানান (etiquette) এবং অভিধানগত অর্থ হলো' সভ্যসমাজে ব্যক্তিগত আচরণবিধি।

এটিকেট ব্যাপারটা বোঝানো খুব সোজা না। 'বিশেষ করে আমার মত একজন আধা-বর্বর, মফঃস্বল চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে। আমার কোনো এটিকেট নেই। আমি কোনদিন কেউ এলে উঠে দাঁড়াই না। প্রকাশ্য ভদ্র সমাজে হাই তুলতে হলে হাই তুলি, হাঁচতে হলে হাঁচি। গরমের দিনে বাসায় খালি গায়ে থাকি, কোনো ভদ্রমহিলা ভাদ্রবধূ, শালাজ বা প্রতিবেশিনী কেউ এলেই জামা বা গেঞ্জি গায়ে দিই না, মুনমুন সেন কিংবা শ্রীদেবী এলেও গায়ে দেবো না, শুধু আমার যৌবনস্বপ্ন এক রমণীরতন আছেন তিনি এই অধমের গৃহে যদি কখনো আসেন সেজন্যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমার একটা ড্রেসিং গাউন আছে, সেটা জীবনে প্রথম গায়ে চড়াবো।

ভদ্রতাবোধের চূড়ান্ত ঘটেছিলো পুরানো চৈনিক সমাজে। একটা নমুনাই যথেষ্ট।

এক লেখকের রচনা সম্পাদকের পছন্দ হয়নি। তিনি লেখককে পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠাচ্ছেন, সঙ্গে এই বিনীত পত্র : হে সুমহান লেখক, হে বাণীর বরপুত্র, চন্দ্রকিরণের মত স্নিগ্ধ ও কোমল, সূর্যরশ্মির মত উজ্জ্বল আপনার প্রতিভা। আপনার রচনাসমূহ আপনার প্রতিভার মতই ভাস্বর। আমরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এবং অভিনিবেশ সহকারে আপনার পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। পাঠ করে আনন্দিত হয়েছি, পুলকিত হয়েছি, চমকিত হয়েছি। আমরা এই বিশাল ত্রিভুবনের তেত্রিশ কোটি দেবতার নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি যে এ রকম মহৎ রচনা আমরা ইতিপূর্বে আর কখনো পাঠ করার সুযোগ পাইনি। ভবিষ্যতে আর কখনো সেরকম সুযোগ আসবে কিনা তাও জানি না।

অথচ আপনার এই অসামান্য রচনা আজ আপনাকে আমাদের ফেরত দিতে হচ্ছে। তার কারণও বড় সাংঘাতিক। আপনার এই রচনা আমাদের পত্রিকায় যদি আমরা এখন ছাপি, ভবিষ্যতে আমাদের পাঠকেরা প্রত্যেক সংখ্যায় সর্বদাই এই রকম উচ্চমানের লেখা প্রত্যাশা করবে। আমরা তাদের যে প্রত্যাশা সহস্র বৎসরেও আর পূরণ করতে পারবো না।

অতএব অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, আশাহত মনে ও ভগ্নহৃদয়ে আপনার এই অমূল্য রচনা আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি। আপনার কাছে আমরা শতকোটি ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি আপনার মহৎ হৃদয়ের গভীরতম উদারতায় আপনি আমাদের অবশ্য অবশ্যই মার্জনা করবেন।

ইতি

আপনার শ্রীচরণে চিরকৃপা প্রার্থী

আপনার ক্রীতদাসের দাসানুদাস

হতভাগ্য সম্পাদক।

এটিকেট নিয়ে সাহেবরাও কিছু কম মাথা ঘামান না। হাঁটা-চলা, কথাবার্তা সমস্ত আচরণ সবই এটিকেটের আওতায় পড়ে। বিলিতি পত্রিকাগুলোতে এটিকেট বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের নিয়মিত ধারাবাহিক কলম আছে, যেখানে জাঁদরেল ভদ্রলোকেরা এবং অভিজাত সুন্দরীরা 'একেই কি বলে সভ্যতা' বিষয়ে পাঠকদের জিজ্ঞাসার জবাব দেন।

খাওয়ার টেবিলে কাঁটা চামচের সুষ্ঠু ব্যবহার, মাথার টুপি কখন খুলতে হবে, মহিলাদের সামনে কিভাবে হাঁচতে বা কাশতে হবে, ঘরে মহিলা প্রবেশ করলে কি করতে হবে, কতটা উঠে দাঁড়াতে হবে, কতটুকু এগিয়ে যেতে হবে, দরজা পর্যন্ত গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে আবার দরজা আড়াল না করে কিভাবে সেই ভদ্রমহিলাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে ভেতরে আসার জন্যে এবং কি করতে হবে তিনি যখন আবার যাবেন—এ সমস্তই সৌজন্য-বিধির পর্যায়ে পড়ে।

এখনো আছে কিনা জানি না, আগেরকালে বিলেতে এটিকেট শিক্ষার ইস্কুল পর্যন্ত ছিলো। এই রকম এক ইস্কুলে প্রাচ্যদেশীয় এক মহারাজপুত্রকে অনেকদিন আগে একসময়ে ভর্তি করা হয়েছিল।

সে ছিলো বেশ কিছুটা নির্বোধ এবং ততোধিক বেয়াড়া। চার সপ্তাহের কষ্টকর পাঠক্রমে সে প্রায় কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনি। দেশে ফিরে আসার পর তার মহামান্য বাবা তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কুমার কি শিখলে এটিকেট ইস্কুলে?' কুমার অনেক চিন্তা করে, অনেক মাথা চুলকিয়ে অবশেষে বললো, 'খুব কঠিন ব্যাপার মহারাজা, সব গুলিয়ে গেছে।'

মহারাজ নিরাশ হয়ে বললেন, 'কিছুই মনে পড়ছে না তোমার?' কুমার বললো, 'শুধু একটা জিনিস মনে পড়েছে। মেমসাহেব বলেছিলেন শীর্ষাসনের সময় টুপি মাথায় না দিতে।'

ভদ্রতা সৌজন্য তথা এটিকেটের ভালো উদাহরণ হলো নিচের চিঠিটি, এই উদাহরণটি দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করছি।

'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র জানাচ্ছেন যে শ্রীমতী কমলেকামিনীর আমন্ত্রণ তিনি বিশেষ ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্যে গ্রহণ করতে পারছেন না এবং এই সুযোগ দেওয়ার জন্যে শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র শ্রীমতী কমলেকামিনীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।'…

অবিশ্বাস্য

এই নামে পুণ্যশ্লোক সৈয়দ মুজতবা আলীর জটিল উপন্যাসটির কথা কারো হয়তো মনে পড়তে পারে। কিন্তু অতটা কঠিন দেহ-তত্ত্বের আলোচনা এখানে বেমানান হবে। আবার, ভুবনবিদিত রিকলে সাহেবের 'বিশ্বাস করুন কিংবা না করুন' পর্যায়ে গিয়ে চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যেও মাথা গলাবো না। তার বদলে আমার যা সাধারণত রীতি সেই হাল্কা খেয়াল-খুশির সীমানায় আবদ্ধ থাকছি।

প্রথম গল্পটা অবশ্য খুব অবিশ্বাস্য নয়, হলেও হতে পারে জাতীয়।

এক দম্পতি এক রম্য শহরে বেড়াতে গিয়েছেন। তখন পুজোর ছুটি চলছে। সেই শহরে চলছে রমরমা ট্যুরিষ্ট সীজন। শহরের সমস্ত হোটেল, গেস্ট হাউস, বোর্ডিং ইত্যাদি কানায় কানায় ভরে গেছে। সেই দম্পতি এ-দরজায় ও-দরজায় অনেক ঘুরেও একটি ঘর জোগাড় করতে পারেন না। অবশেষে শহরের শেষ প্রান্তে রেললাইনের ধারে এক পুরনো নড়বড়ে কাঠের বাড়ির দোতলার এক হোটেলে একটি ঘর পেলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। স্ত্রীকে হোটেলের ঘরে রেখে ভদ্রলোক দু'একটা টুকিটাকি দরকারী জিনিস কিনতে বেরোলেন। একে ভ্রমণের পরিশ্রম, তার ওপরে ঘর খোঁজার ঝামেলা—স্ত্রী বেচারা স্বামী বেরিয়ে যেতেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে তাঁর চোখে তন্দ্রা নেমে এলো। মহিলা প্রায় ঘুমিয়ে পড়ছেন এমন সময়ে ঘরের পাশের রেললাইন দিয়ে একটা ট্রেন দ্রুত বেরিয়ে গেল। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে কাঠের নড়বড়ে বাড়িটা ভয়াবহভাবে কেঁপে উঠলো এবং মহিলা হঠাৎ ছিটকে খাটের ওপর থেকে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

মহিলা কোন রকমে সামলে-সুমলে উঠে আবার বিছানায় শুতে না শুতেই আবার ট্রেন, আবার ঝাঁকুনি, আবার খাট থেকে মেঝেতে পতন হলো মহিলার।

একরকম নাজেহাল হয়ে মহিলা অত্যন্তই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, ছুটে গেলেন কাঠের সিঁড়ির নীচে হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে, গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—এটা কী রকম হোটেল আপনার ? এটা কি ঘর দিয়েছেন, বলুন দেখি ? লাইন দিয়ে ট্রেন গেলে বিছানা থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়তে হয়।

ম্যানেজার স্বভাবতই প্রবল আপত্তি জানালেন, বললেন—হোটেল আমার তেমন ভালো নয় সেটা অস্বীকার করবো না। ঘরটাও রেললাইনের ধারে। কিন্তু ও ঘরে তো আগেও লোক থেকেছে, হামেশাই থাকছে। কেউ কখনো অভিযোগ করেনি যে, ট্রেন গেলে খাট থেকে ছিটকে পড়ে গেছে।

একথায় মহিলা আরও উত্তেজিত হলেন, বললেন—তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি ? আপনার এতবড় সাহস। আপনি আসুন দেখি আমার সঙ্গে।

ম্যানেজার সাহেবের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে মহিলা তাঁর ঘরে নিয়ে গেলন। তারপর জানলা দিয়ে দূরে তাকিয়ে বললেন—'ঐ তো স্টেশনে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, সিগন্যালও ডাউন দিয়েছে, ট্রেনটা এখুনি এখান দিয়ে যাবে। আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন দেখি। দেখি ছিটকে পড়েন কি না !

ম্যানেজার সাহেব কোন প্রতিবাদ করার সুযোগ পেলেন না। কি আর করবেন তিনি খাটের ওপরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এই মোক্ষম মুহূর্তে কেনাকাটা সেরে স্বামী হোটেলের ঘরে ফিরলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে ভদ্রলোক স্তম্ভিত, তাঁর বিছানায় হোটেলের ম্যানেজার শুয়ে রয়েছেন। ম্যানেজার সাহেবও ঘটনা পরম্পরায় রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেছেন।

স্বামী চিৎকার করে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হচ্ছে কি আমার বিছানায় ? ম্যানেজার সাহেব ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললেন—'আমি জানি, আপনি বিশ্বাস করবেন না, কেউই করবে না। তবু সত্যি কথাটা হলো আমি একটা রেলগাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছি।

ম্যানেজার সাহেবের ভাগ্য ভালো, রক্ষা পেয়ে গেলেন। কারণ সেই মুহূর্তে স্টেশনের ট্রেনটা ভীমবিক্রমে পাশের লাইন দিয়ে ছুটে গেল এবং ম্যানেজার সাহেব প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিছানা ধরে থাকতে পারলেন না, মেঝেয় ছিটকে পড়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিছানা সংক্রান্ত অন্য একটি অবিশ্বাস্য গল্প আছে। সেটি একটি বহুতল ফ্ল্যাট বাড়িতে ঘটেছিল। এ-গল্পটা অন্য সূত্রে বোধহয় অন্যত্র বলেছি, সে জন্যে স্মৃতিরত্নদের ক্ষমা প্রার্থনীয়।

বহুতল বাড়িগুলিতে বিভিন্ন তলায় বিভিন্ন ফ্ল্যাট সবই প্রায় একরকম দেখতে। ছয়তলার দক্ষিণের ফ্ল্যাটের সঙ্গে পাঁচতলার কিংবা সাততলার দক্ষিণের ফ্ল্যাটের পার্থক্য সামান্যই। সুতরাং ভুল হতেই পারে।

এইরকম একটি নতুন ফ্ল্যাটবাড়িতে সদ্য উঠে এসেছেন বিভিন্ন পরিবার। তখনো যার যার নিজের মনে নিজের আবাস সুচিহ্নিত হয়নি। এইরকম সময়ে এক ভদ্রলোক বাড়ি ফিরে নিজের ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে সহসা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, তিনি যা দেখলেন তা দেখে তাঁর মুখ থেকে নিচের কথাগুলি বেরিয়ে এলো—এ কি মলিনা, এ ভদ্রলোক কেন? ইনি আমার বিছানায় শুয়ে কেন? সর্বনাশ! ছি! ছি!

ভদ্রলোকের অতর্কিত প্রবেশ ও এইরকম কথা শুনে শয্যাস্থিত শায়িত দম্পতি চমকে উঠে বসেছেন এবং ততক্ষণে ভদ্রলোকও নিজের ভুল ধরতে পেরেছেন। তাড়াতাড়ি সরি, ভেরি সরি, এটা সাততলা নয়, ভেরি সরি, রং ফ্লোর, এই বলে বিস্মিত দম্পতিকে ছয়তলার ফ্ল্যাটে ফেলে রেখে সামনের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে সাততলায় উঠে গেলেন নিজের বাসায়।

অবিশ্বাস্য নামক নিবন্ধে পাগলকে বাদ দেওয়া উচিৎ হবে না।

এক খ্যাতনামা উন্মাদকে দেখেছিলাম খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠি লিখছেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একটা বেশ লম্বাচওড়া চিঠি।

পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম চিঠিটা কার উদ্দেশ্যে লেখা হচ্ছে। কিন্তু দেখলাম 'সবিনয় নিবেদন' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, ধরা গেলো না ঠিক কাকে চিঠি লিখছেন এই উন্মাদ মহোদয়।

আমি উঁকিঝুঁকি দেওয়ায় তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে আমার দিকে চিঠি লেখা থামিয়ে তাকিয়ে রইলেন। একটু অস্বস্তি হলো, নরম করে জিজ্ঞাসা করলাম—চিঠি লিখছেন বুঝি? উন্মাদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ।

একটু একটু সাহসী হয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলাম—কাকে লিখছেন চিঠিটা? উন্মাদ বললেন—আর কাকে চিঠি লিখবো আমি? নিজেকে লিখছি, নিজের কাছেই চিঠি দিচ্ছি।

এমন দার্শনিকসুলভ কথা শুনে বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—কি লিখলেন চিঠিতে? এবার অমায়িক হাসি হাসলেন উন্মাদ, বললেন—বা তা কি করে বলবো। আগে চিঠিটা শেষ হোক, তারপর খামে ভরে পোস্ট করি, তারপরে ডাকে আমার কাছে আসুক, তখন খুলে পড়ে দেখে জানতে পারবো কি লিখেছি? তাই না?

ভালোবাসা-ভালোবাসা

একটি রাস্তায় পাশাপাশি দুই বাড়িতে দু'টি শিশু থাকে। বালক ও বালিকা। বালকটির বয়েস সাত, বালিকাটির বয়েস ছয়।

যেমন হয়, দু'জনার মধ্যে খুব ভাব, একেবারে যাকে বলে গলায় গলায় ভালোবাসা: এ ওকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না, ও একে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না। রীতিমত বাল্যপ্রণয় বলা যায়।

কিন্তু এ প্রণয়েও একদিন ছেদ পড়লো, এই ভালোবাসায় নেমে এলো যবনিকা। মেয়েটির মা দেখলেন তাঁর কন্যার বালকবন্ধুটি আর তাঁদের বাড়িতে আসে না, এমনকি তাঁর মেয়ে ছেলেটির বাড়িতে গেলেও সে তার সঙ্গে খেলতে আসে না, মোটে পাত্তাই দেয় না।

মেয়েটির মা ব্যাপারটা কি জানার জন্যে নিজে থেকে একদিন গেলেন

ছেলেটির বাড়িতে, গিয়ে জানতে চাইলেন, 'খোকা, তুমি আর খুকুর সঙ্গে খেলা করো না কেন ?'

খোকা কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল। তখন মেয়ের মা ছেলের মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওদের তুজনের মধ্যে এত ভাব ভালোবাসা ছিল, হঠাৎ কি হলো ?'

ছেলের মা মৃত্তু হেসে জবাব দিলেন, 'খোকার বাপ ওকে একটা গিনিপিগ কিনে দিয়েছেন। তারপর থেকে খোকা রাতদিন ঐ গিনিপিগ নিয়ে মেতে আছে। এখন আর ভাব ভালোবাসার সময় কোথায় ওর ?'

এই গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে যতটা হাল্কা মনে হচ্ছে তা হয়তো নয়। ভালোবাসার বদলে গিনিপিগ নিয়ে শুধু ঐ শিশুটিই নয়, আরো অনেকেই খেলা করে।

ভালোবাসার অর্থ একেক জনের কাছে একেক রকম। বছর ষাটের আগের কথা। পূর্ববঙ্গের এক ব্রাহ্মণবর্জিত গ্রামের লোকেরা স্থানীয় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সেবাপুজোর জন্যে কলকাতা থেকে এক ব্রাহ্মণ পূজারীকে মাস মাইনেয় ঠিক করে তাঁদের গ্রামে নিয়ে যান।

বছর খানেক বেশ ভালোই গেলো। তারপর একদিন দেখা গেলো বামুন ঠাকুর বাক্স প্যাঁটরা গোছাচ্ছেন। তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন।

গ্রামের লোকেরা খুব তুঃখিত হলেন। তাঁরা বললেন, 'ঠাকুর আমরা কি অপরাধ করেছি। আপনার মাইনেপত্র সবই তো আমরা ঠিকঠাক সময়মতো দিয়েছি।'

বামুনঠাকুর বললেন, 'মাইনেপত্রের কথা হচ্ছে না। মাইনে তো সব জায়গায়ই দেয়, তোমরাও দিয়েছো। সে জন্যে যাচ্ছি না। যাচ্ছি ভালোবাসার অভাবে, তোমাদের গাঁয়ে যেটার অভাব, সেটা হলো ঐ ভালোবাসার অভাব।'

ঠাকুরমশায়ের কাছ থেকে এই অভাবিত তথা অপ্রত্যাশিত অভিযোগ শুনে গাঁয়ের মানুষেরা তাজ্জব, রীতিমত হতবাক হয়ে গেলো।

তখন ঠাকুরমশায় প্রাঞ্জল করে বললেন, 'ত্তাখো, তোমরা আমাকে

ভালোবাসো না। যদি সত্যি ভালোবাসতে তবে এই এক বছরের মধ্যে শুধু মাইনে ছাড়াও অন্তত কলাটা-মুলোটা, ধুতি-চাদর-সোনা-দানা কিছু অবশ্যই কখনো না কখনো দিতে। তা দাওনি। তারপরে তোমরা নিজেদেরও একদম ভালোবাসো না। যদি বাসতে তাহলে এই এক বছরের মধ্যে অন্তত একটা বিয়ে তো হতো. একটা বাচ্চা তো জন্মাতো, আমি তাহলে বিয়েতে বা অন্নপ্রাশনে পুরুতগিরি করে কিছু পেতাম। কিন্তু তাও হলো না।'

ঠাকুরমশায়ের এত কথা বলে দম ফুরিয়ে এসেছিলো কিন্তু তখনো তাঁর কিছু বক্তব্য বাকি ছিল এবং সেটা সবচেয়ে ভয়াবহ।

প্রভূত পরিমাণ অক্সিজেন নাক দিয়ে টেনে নিয়ে অতঃপর ঠাকুরমশায় বললেন, 'আর তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা ভগবানও তোমাদের মোটেই ভালোবাসেন না। যদি সত্যিই ভালোবাসতেন তবে নিশ্চয়ই এই এক বছরের মধ্যে তোমাদের দু'একজনাকে নিজের কাছে টেনে নিতেন। তাহলে অন্তত দু'একটা শ্রাদ্ধে যজমানি করে ধুতি, ছাতা, গরু, এসব কিছু কিছু পেতাম।'

যদি এখানে বলা যেতো যে আমাদের গল্পের এই ব্রাহ্মণ ভালোবাসা-হীনতা নামক এক প্রাচীন অসুখে ভুগছিলেন তাহলে খারাপ হতো না। কিন্তু এটা আসল ভালোবাসার গল্প নয়।

ভালোবাসা নিয়ে নিম্নবঙ্গে একটি চলিত কথা আছে।

'আমার তোমার ভালোবাসা
চামারবাড়ি শুয়োর পোষা।'

কথাটা খুবই নির্মম। খাই-দাইয়ে, যত্ন করে শুয়োরকে অনেক ভালোবেসে নাদুসনুদুস নধরকান্তি করা হলো সে শুধু তাকে যথাসময়ে কেটে খাওয়ার জন্যে।

এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা মনে করেন সব ভালোবাসাই শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক, ভালোবাসা ব্যাপারটা এক রকমের ধান্দা, উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত্র।

আমরা এই সমস্ত জটিল প্রশ্নের মধ্যে যেতে চাই না। তার চেয়ে আমরা এতক্ষণে আসল ভালোবাসার গল্পে যাই।

প্রথমেই সেই বহু পুরাতন দাম্পত্য প্রেমের দু'টি উপাখ্যান বলি।

এক নম্বর উপাখ্যানটি সবারই পরিচিত। বিকেলবেলা অফিস থেকে-

ফিরে স্বামী ক্লান্ত দেহে ইজিচেয়ারে শুয়ে সকালে তিনবার আগাগোড়া পড়া খবরের কাগজটি আবার উল্টে পাল্টে পড়ছেন। স্ত্রী চায়ের পেয়ালা হাতে পতিদেবতার পাশে এসে বসলেন, স্বামী নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলেন। বলা বাহুল্য, অফিস থেকে ফেরা ইস্তক তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথাও বলেননি।

অবশেষে স্ত্রী বললেন, 'ওগো, তুমি আমার আর আগের মত ভালোবাস না কেন? আগে কত কথা বলতে সাধ-আহ্লাদ, ভালোবাসার কথা, এখন আর কিছুই বলো না। এখন আর আমাকে একটুও পছন্দ করো না।'

এই কথা শুনে স্বামী খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'তোমাকে কে বলেছে যে আমি আর তোমাকে ভালোবাসি না, পছন্দ করি না। এখনো আমি তোমাকে একইরকম ভালোবাসি, শুধু একটা অনুরোধ, ঘ্যানর-ম্যানর না করে চুপ করে থাকো। দয়া করে আমাকে এখন এই খবরের কাগজটা একটু পড়তে দাও।'

দ্বিতীয় উপাখ্যানটি কিন্তু এর চেয়েও মর্মান্তিক।

রমেশের সঙ্গে রমেশের স্ত্রীর ঝগড়া হয়েছে। রীতিমত সাংঘাতিক ঝগড়া। চুলোচুলি, মারামারি না হলেও আপর্যাপ্ত গালাগাল করেছে দু'জনা দু'জনকে।

রমেশই ঝগড়াটা শুরু করেছিল। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে রমেশ পারবে কেন? সে রণে ভঙ্গ দিয়ে বাড়ি থেকে পলায়ন করলো।

ঝগড়াটা হয়েছিল সকালবেলায়। স্নান-খাওয়া না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল রমেশ। ঐ অস্নাত, অভুক্ত অবস্থাতেই অফিস। তারপরে অফিস ভাঙলো, ততক্ষণে রমেশের মনে অনুশোচনা দেখা দিয়েছে, যেটা পুরুষ মানুষদের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা।

রমেশ নিজের মনে মনে ভাবলো, সকালবেলা ঝগড়াটা আরম্ভ না করাই উচিত ছিল। শুধু শুধু ঝগড়া করে দিনটা নষ্ট হলো। অবশেষে অনুতপ্ত রমেশ বাড়িতে ফোন করলো, তার ধারণা তার স্ত্রীও নিশ্চয় একইরকম অনুতপ্ত বোধ করছে।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

'হ্যালো' বলার পর ফোনের অপর প্রান্তে স্ত্রীর পরিচিত কণ্ঠে 'হ্যালো' শুনে রমেশ উৎসাহিত হয়ে বললো, 'আমি রমেশ বলছি। আজ রাতে কি রান্না করছো?'

ওদিক থেকে তিক্ত কণ্ঠে জবাব এলো, 'বিষ। রাতের জন্যে বিষ রান্না করছি।' এই সুসংবাদ শুনে রমেশ একটু বিচলিত হলো, তারপর বললো, 'ভালোই তো। তবে একজনের জন্যে রান্না করো। আমি রাতে বাসায় খাবো না, বাইরে খেয়ে নেবো। বাসায় যা রান্না করছো তুমি খেয়ে নিয়ো।'

সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার কথা আছে বাইবেলে। পাতার পর পাতা, সূত্রের পর সূত্র শুধু ভালোবাসা আর ভালোবাসা, একে ভালোবাসা, ওকে ভালোবাসা, তাকে ভালোবাসা ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ভালোবাসায় স্তবকবচমালার কাছে ওমর খৈয়াম তুচ্ছ, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি শিশু।

এই বাইবেলীয় ভালোবাসা নিয়ে জি কে চেস্টারটনের একটা রসিকতা মনে পড়ছে।

চেস্টারটন সাহেব বলেছিলেন যে 'বাইবেল নির্দেশ দিচ্ছে আমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসতে, আবার বাইবেলেই রয়েছে যে শত্রুদের ভালোবাসো।' এই সূত্রে জি কে চেস্টারটন মন্তব্য করেছিলেন, 'আসলে এই দুই জাতের লোকই এক।' অর্থাৎ প্রতিবেশী মাত্রেই শত্রু। সুতরাং প্রতিবেশীদের ভালোবাসলে শত্রুকেই ভালোবাসা হবে।

বাইবেলজড়িত ভালোবাসার একটি শিশুপাঠ্য গল্পও আছে।

একটি বাচ্চা মেয়েকে তার বাবার এক বন্ধু বাসায় এলেই নানা প্রসঙ্গে খ্যাপাতেন। মেয়েটিও খুব চটে যেত, অবশেষে একদিন খুবই চটে গিয়ে সে তার পিতৃবন্ধুকে যা নয় তাই বললো।

গালাগাল শুনে ভদ্রলোক খুব দুঃখিত হলেন, তারপর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, খুব কঠোরভাবে মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি যখন এই সব খারাপ বলছো, তাহলে তোমাকে আর কখনো ভালোবাসবো না।'

একটুও দমিত না হয়ে মেয়েটি বললো, 'তা হবে না। তোমার আমাকে ভালোবাসতেই হবে।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন, 'কেন ভালোবাসতে হবে?'

মেয়েটি বললো, 'কারণ বাইবেল বলেছে যে, যে তোমাকে ঘেন্না করে তাকে ভালোবাসবে। আমি তোমাকে ঘেন্না করি তাই তুমি আমাকে ভালোবাসবে।'

ভালোবাসার সঙ্গে ঘৃণা নাকি যৎকিঞ্চিৎ মেশানো থাকে। শুধু ঘৃণা নয়, কিছু রাগ, কিছু ঈর্ষা, কিছু দুঃখ, কিছু বেদনা নিকষ ভালোবাসার সঙ্গে এই সব খাদ মিশিয়ে আসল ভালোবাসা তৈরি হয়।

ইংরেজ কবি উইলিয়াম কাউপার বলেছিলেন, তোমাকে তবুও ভালোবাসি, তোমার সমস্ত দোষ শুদ্ধ ভালোবাসি।'

এর অনেক, অনেক পরে বাংলার শেষ পল্লীকবি লিখেছিলেন,

'আমার এর ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা
আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই
যে মোরে করেছে পর।'

জসীমউদ্দীনই লিখেছিলেন, 'আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি।' তিনি বাংলার বৈষ্ণব কবিতার, সহজিয়া চিন্তার সার্থক উত্তরসূরী।

কিন্তু ভালোবাসা, বৈষ্ণব কবিতা নয়, সহজিয়া প্রেম নয় তার চেয়ে অনেক জাগতিক, অনেক আলাদা। এই তো সেদিন নবীন যুগের নবীন কবি রহস্যভাবে লিখেছিলেন, 'মনীষার ভালোবাসা মাহুতের মত ছিল উঁচু।' তার আগে কে জানতো ভালোবাসার এতটা উচ্চতা।

কাব্য করে কোনো লাভ হচ্ছে না। ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে যাচ্ছে। ভালোবাসা বিষয়ক একটা নিরর্থক গল্প দিয়ে এই অমূল্য নিবন্ধ শেষ করি।

মহানগরীর জনপথে এক সুন্দরী মহিলা একলা একলা হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ভদ্রলোক তাঁকে দেখে তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে লাগলেন। যথাসময়ে ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা টের পেলেন। কিছুক্ষণ এরকম চলার পর ভদ্রমহিলা দাঁড়ালেন, তারপর ভদ্রলোকের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমাকে অনুসরণ করছেন কেন?'

ভদ্রলোকে বললেন, 'আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি ?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'প্রেম ? আপনি আমাকে চেনেন ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'তা হয়তো চিনি না। আমার এই ভালোবাসা খাঁটি। যাকে বলে একেবারে প্রথম দর্শনে ভালোবাসা।'

ভদ্রমহিলা বললে, 'ও তাই নাকি। কিন্তু আপনি শুধু শুধু আমার প্রেমে পড়লেন কেন ? ঠিক আমার পিছনেই আমার ছোট বোন আসছে, সে আমার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। আমাকে ভালোবাসার আগে তাকে একটু দেখুন।

এই কথা শুনে ভদ্রলোক স্বভাবতই থমকে দাঁড়ালেন এবং পিছন ফিরে তাকালেন। দুঃখের বিষয়, তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে কোনো সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পেলেন না, দেখতে পেলেন এক অত্যন্ত কুৎসিৎদর্শনা রমণীকে।

ততক্ষণে সম্মুখবর্তিনী সুন্দরী অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ভদ্রলোক এক ছুটে তাঁর পাশে গেলেন, অনেকটা দৌড়িয়ে তার কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়েছে, তিনি হাঁপাচ্ছেন, হাঁপাতে হাঁপাতে ভদ্রমহিলাকে তিনি বললেন, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বললেন কেন ?

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনিই কি আমাকে সত্যি কথা বলেছিলেন ?'

তখনো হাঁপাচ্ছেন ভদ্রলোক, একটু নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, 'কি মিথ্যে কথা বলেছি ?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'মিথ্যে কথা নয় ? যদি আপনি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন তাহলে পিছন ফিরে খুঁজতে গেছেন কেন আমার চেয়ে বেশি সুন্দরীকে ?'

পুনশ্চ : একটি খণ্ড নাটিকা

প্রেমিকা : তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

প্রেমিক : খুব ভালোবাসি।

প্রেমিকা : আমি মারা গেলে তুমি কাঁদবে ?

প্রেমিক : খুব কাঁদবো।

প্রেমিকা : একটু কেঁদে দেখাও না।

প্রেমিক : আগে একটু মরে দেখাও না।

কাকের মাংস

নগর বিশ্রুত এক মদ্যপের কথা অনেকেই জানেন। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় গেলাসে একটু একটু করে পানীয় ঢালতেন আর অল্প পরেই কাঁদতে শুরু করতেন, আমার কি যে হয়েছে, যত খাই তবু আমার কিছুতেই নেশা হয় না!' অল্প খাওয়ার পরেই তাঁর এই দুঃখ শুরু হতো এবং তারপরে ক্রমশঃ খেয়ে যেতেন, ফলত নেশা বেড়ে যেত আর 'নেশা হয় না' বলে আরো বিলাপ জুড়ে দিতেন।

যখনই নটবর হালদারের কথা মনে পড়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরের কাহিনীটি মনে পড়ে যায়। নটবর হালদার পাগল হতে চেয়েছিলেন। তাঁকে কে যেন বলেছিল কাকের মাংস খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। বহু কষ্টে তিনি একটি কাক সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর যথারীতি সেটাকে কেটে মাংস রান্না করে খেয়েছিলেন। খেতে কেমন লেগেছিল, ভগবান জানেন, কিন্তু তারপর থেকে দৈনিকই তিনি যেভাবে হোক একটি কাক ধরে এনে তার মাংস খেতেন। আর কেবলই আক্ষেপ করতেন, 'কি করে যে পাগল হবো বলুন দেখি? কাকের মাংস খেলে নাকি পাগল হয়? কত যে কাকের মাংস খেলাম, ধরতে গেলে প্রতি দিনই একটা করে কাক রান্না করে খাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না আমার।'

নটবরবাবুর কিছু হলো না বটে কিন্তু নটবরবাবুর পাড়ার লোকেরা পাগল হয়ে উঠলেন। জবাই করা কাকের পালক রাস্তায় ফেলে দিতেই জগৎসংসারের যেখানে যত কাক ছিল নটবরবাবুদের পাড়া মনোহরপুকুরে এসে চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। আর সে কি চেঁচামেচি, হাজার হাজার কাকের চিৎকারে কান পাতা যায় না। ছাদে ছাদে কাক, প্রত্যেক জানালার আলসেয় কাক, ল্যাম্প পোষ্টে আষ্টেপৃষ্ঠে কাক সব তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, কাকের চিৎকার ছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিছু শোনা যাচ্ছে না;

আর যত কোলাহল বাড়ছে দূর দূর থেকে আরো আরো কাক চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে।

দিনের পর দিন এই রকম চললো। পাড়ার লোকে অস্থির, শুধু নটবরবাবুরই ভ্রূক্ষেপ নেই। বহু লোক পাড়া ছেড়ে চলে গেলো, পাড়ার মধ্যে দুটো স্কুল ছিলো বন্ধ হয়ে গেলো, মনোহরপুকুরে বাড়ি ভাড়া কমতে কমতে দুই কামরার ফ্ল্যাট পনেরো টাকা মাসিক এসে দাঁড়ালো। পাড়ার দু-একজন প্রভাবশালী লোক উপর মহলে নালিশ জানালো। কিন্তু তাঁরা কেউই কিছু করতে সক্ষম হলেন না।

কোথাও এমন কোনো আইন নেই যার বলে কাকের মাংস খাওয়ায় বা রাস্তায় কাকের পালক ফেলায় বাধা দেওয়া যেতে পারে। একজন পরামর্শ দিলেন, পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির কাছে যান। কিন্তু পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি কি করবে? তাঁরা একটা চিঠি দিলেন নটবরবাবুকে, কাকের মতন এমন নিরীহ পাখীকে প্রত্যহ হত্যা করা অতি গর্হিত কাজ। অন্তত আপনার মত সদাশয় ব্যক্তির পক্ষে!'

নটবরবাবু পর দিনই জবাব দিলেন. 'আমি মোটেই সদাশয় নই। আমাকে ঘাঁটাবেন না মশায়রা, আমি পাগল হতে চাই, তাই কাকের মাংস খাই। আর কাক মোটেই নিরীহ পাখী নয়, তাহলে তাদের অত্যাচারে আমাদের পাড়ার লোকেরা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতো না। তাছাড়া বহু দিন ধরে মানুষ হাঁস-মুরগী এসব কেটে খাচ্ছে, আগে সেটা প্রতিরোধ করুন, তারপর আমাকে বলবেন।'

বলা বাহুল্য এর পর পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি আর একটুও এগোয় নি। তবে পাড়ার লোকের পেড়াপিড়িতে থানা থেকে একদিন লোক এসেছিলো। ঠিক একদিন নয়, দু-দিন এসেছিলো। একদিন দিনের বেলায়. কিন্তু সেদিন কাকের ভিড় ঠেলে হরকিষেণ জমাদার এবং তাঁর সঙ্গীরা মনোহরপুকুরে ঢুকতে না পেরে ফিরে যায়। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় এলো।

কিন্তু পুলিশই বা কি করবে? তারা নটবরবাবুকে অনেক রকম ভয় দেখালো। তিনিও নাছোড়বান্দা, ভয় পাবার লোক নন। আর পুলিশের কি ক্ষমতা আছে এ ব্যাপারে। কেউ আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে তাকে

পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কেউ পাগল হওয়ার চেষ্টা করছে, তার জন্যে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিধান কোনো পুলিশ-সংহিতায় নেই।

আমার দোসর যে জন

একদা এক চিকিৎসক ঘরনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনার স্বামী যখন আপনার পাণিপ্রার্থনা করলেন তখন আপনার মনের ভাব কি রকম হয়েছিলো?' ভদ্রমহিলা মধুর হাসি চেপে বললেন, 'উনি যে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করলেন আমি বুঝতেই পারি নি।' আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'মানে?' মহিলা ব্যাখ্যা করলেন, 'তখন উনি নতুন ডাক্তার।'

আমি তখন ওঁর সদ্যরোগিনী। একদিন হঠাৎ আমার ডানহাতটা চেপে ধরতে আমি ভাবলাম বুঝি আমার নাড়ি দেখছেন। তারপর দেখি তা নয়। মুখে বলছেন, 'বলো আমাকে বিয়ে করবে?'

আরেকটি বিবাহের প্রস্তাবের গল্প জানি, দুঃখের বিষয় সেটা এত মধুর নয়।

একটি যুবক তার প্রেমিকাকে বিবাহের প্রস্তাব করা মাত্র মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠলো। ছেলেটি বিব্রত হয়ে বললো, কি হলো? আমি কোনো অন্যায় বললাম।' মেয়েটি আবার ডুকরিয়ে উঠে বললো, 'নাগো না। এ আমি আনন্দে কাঁদছি।' প্রেমিক অবাক, 'আনন্দে কাঁদছো?' মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আজ আমার কি আনন্দ, কি আনন্দ! আমার মা বলেছিলো আমার মতো গাধাকে কোনোদিন কোনো উল্লুক ছাড়া আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। মা, মা গো, আজ তুমি যদি বেঁচে থাকতে!' মেয়েটির ফোঁপানি বেড়ে গেলো।

মেয়ে আনন্দে কাঁদতে থাকুক। কেঁদে যাক। শ্রীমান উল্লুকের সঙ্গে

শ্রীমতী গাধার পরিণয় পরিণাম মধুর হোক, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। ষোড়শ শতকের ফরাসী প্রবন্ধকার, যিনি প্রবন্ধ রচনার জনক বলে অভিহিত, সেই সাহেব (Michel de Montaigne) বলেছিলেন, সবচেয়ে ভালো বিয়ে হলো সেটা সেখানে বৌ অন্ধ আর বর কালা।

পরিষ্কার করে বলা চলে, বর যা করবে বা করছে বৌ দেখতে পাবে না, আর বৌ যা গালাগাল করবে বর তা শুনতে পাবে না, সেটাই বিয়ে টেঁকানোর মূল শর্ত। তাই যদি হয়, তবে গাধা আর উল্লুকের বিয়েও নিশ্চয় টিকবে।

অতএব এ সম্পর্কে মাথা না ঘামিয়ে আমরা পরবর্তী প্রসঙ্গে যেতে পারি।

পরবর্তী প্রসঙ্গ একটু জটিল। পবিত্র প্রাচীন টেস্টামেণ্টে (Old Testament, Genesis II. 23.) দোসর সম্পর্কে বলা হয়েছে। দোসর হলো অন্য দোসরের মজ্জার মজ্জা, অস্থির অস্থি।

আর আমরা ভারতীয় হিন্দু, আমাদের যদিদং হৃদয়ং শুধু নয়, হৃদয় থেকে অনেক বেশি, ইহকাল পরকাল। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই সমর্পণ করেছি সেই মহীয়সী কিংবা মহানের করকমলে, যাঁর সঙ্গে সাত পাক ঘুরেছি কিংবা বিবাহ নিবন্ধের খেরোখাতায় যাঁর পাশে নাম সই করে ধন্য হয়েছি।

এই অস্থির অস্থি, মজ্জায় মজ্জা হওয়া, এই সাত পাকে আবদ্ধ হওয়া সোজা কথা নয়। কিছুকাল আগে এক মফঃস্বল শহরে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে যাই।

যে বাড়িতে ছিলাম, একদিন সকালে তার পাশের বাড়ি থেকে একটি যুবক ছুটে বেরিয়ে এলো। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, যুবকটি রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে তারপর শূন্যে লাফিয়ে উঠে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলো। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে রাস্তা থেকে ছেলেটিকে ওঠালাম। তারপর বললাম, 'ব্যাপারটা কি?'

যুবকটির কপাল কেটে গেছে, হাঁটু ছড়ে গেছে। পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে কপালের ধুলো, রক্ত আর ঘাম মুছে, শরীরটা ঝেড়ে নিয়ে যুবকটি আমাকে বললো, 'জানেন, আজ আমার বড় আনন্দের দিন।

আমার ধারণা ছিলো আমার ভাবী শ্বশুরমশায় আমার বিয়ের প্রস্তাবে থেমে যাবেন। আজ এই মাত্র যেই তাঁকে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবো বললাম তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। আর আমিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তাই বলে শূন্যে লাফিয়ে মাটিতে ছিটকিয়ে পড়ে আহ্লাদে রক্তারক্তি করতে হবে।' ছেলেটি বোকা হেসে বললো, 'না দাদা তা নয়। আমার খেয়ালই ছিলো না যে সাইকেলটা নিয়ে আসি নি। আমি বাইরে এসে যেই শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে সাইকেলে চড়তে গেলাম, সাইকেলটা না থাকায় মাটিতে পড়ে গেলাম। শেষবারের মত গায়ের ধূলো ঝেড়ে যুবকটি দ্রুতপদে শিস্ দিতে দিতে চলে গেলো।

অবশেষে প্রকৃত শুভবিবাহের একটি গল্প বলি।

গল্পটি সংলাপ নয়, নাটকীয়।

'তাহলে তুমি ভাস্বতীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে ?'

'তা দিলাম।'

'তা ভাস্বতী কি বললো ?'

'ভাস্বতী জানতে চাইলো, আমার কি ভবিষ্যত, আমার কি আছে ?'

'তুমি তোমার বড়লোক, নিঃসন্তান, বিপত্নীক ডাক্তার মামার কথা বললে না ?'

'তা বললাম।'

'ভাস্বতী খুব খুশি হলো ?'

'শুধু খুব খুশি নয়, ভাস্বতী আমার মামীমা এখন।'

স্বর্গ নরক

এই বিশ্বসংসারে যত কিছু বিষয় আছে, কুকুর-বিড়াল, মাতাল, উকিল-ডাক্তার এমনকি ছাতা-তালা কিংবা টর্চলাইট-প্রেসারকুকার ইত্যাদি সমস্ত প্রাণী ও দ্রব্য নিয়ে আমার পক্ষে যা সম্ভব উলটো পালটা সবই লিখে ফেলেছি এবং তাও কোনো সদুদ্দেশ্য বা সাহিত্যের আদর্শের তাড়নায় নয় নিতান্ত অর্থ ও তাৎক্ষণিক খ্যাতির লোভে।

সুতরাং এবার আমাকে পরমার্থের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে। এদিকে বয়েসও বাড়ছে, হাসি-ঠাট্টা আর কতদিন করা যায়। এবার স্বর্গের দিকে হাত বাড়াই। বামনদের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর একটা অক্ষম প্রয়াস থাকে। আমার এইচেষ্টাও তাই।

এই আলোচনার গোড়াতেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে স্বর্গ সম্পর্কে আমার ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পাঠ্যবইতে সকলের সংগে সেই সরল কপিটি আমিও কণ্ঠস্থ করেছিলাম, যেখানে কবি বলেছিলেন অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক ? এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই জবাব দিয়েছিলেন যে সে বহুদুর নয়। মানুষের মধ্যেই স্বর্গ নরক রয়েছে। স্বর্গ নরক মানুষ তার নিজের ব্যবহারে রচনা করে।

এসব কাব্যকথা থাক, স্বর্গ সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনা ধর্মকথার সূত্রেই যাওয়া উচিত।

হিন্দুব স্বর্গে পারিজাত কানন আছে, আছে মন্দাকিনী নদী, আছে অনন্ত যৌবনা উর্বশী-রম্ভা-মেনকা এই সব সুরসুন্দরীরা। সেখানে অমৃতের ফোয়ারা। সুস্বাদু পানীয় ও খাদ্য স্বর্গবাসীদের জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত। এবং সংগত কারণেই স্বর্গবাসীরা অজর এবং অমর।

খ্রীষ্টানের স্বর্গ অর্থাৎ যাকে বাইবেলে প্রমিসড ল্যাণ্ড বলা হয়েছে সেখানে

মধু ও দুধের বন্যা বয়ে চলেছে। এ বিষয়ে গল্প আছে, এক পাদ্রী এক বালিকাকে নিষেধ করেছিলেন যাতে সে কুকুর-বিড়াল না ভালোবাসে। তিনি মেয়েটিকে বলেন, তোমার বিড়াল বা কুকুর যখন মরে যাবে, তুমি মনে কষ্ট পাবে, তাদের আর কোনোদিন দেখতে পাবে না।

পাকা মেয়েটি একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলো, কেন, আমি যখন মরে যাবো তারপর স্বর্গে যাবো, তখন ওদের সঙ্গে আমার স্বর্গে দেখা হবে। পাদ্রী তখন বললেন, তা সম্ভব নয় কারণ জীবজন্তু কোনোদিন স্বর্গে যেতে পারবে না। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, বাঃ, তা কেন হবে ? স্বর্গে যে দুধ আর মধুর বন্যা বয়ে যায়, সেখানে যদি গরু আর মৌমাছি না থাকে তা হলে ঐ দুধ আর মধু আসে কি করে ?

স্বর্গের বা পরলোকের বিষয়ে হজরত মুহম্মদের একটি কাহিনী স্মরণীয়। হজরত একদিন একটি খেজুরের পাতার চাটাইয়ের উপরে ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁর এক ভক্ত তাঁকে বলেছিলেন, আপনি যদি অনুমতি করেন আমি তা হলে একটা ভালো বিছানা আপনার জন্যে তৈরী করে দিই। শুনে হজরত মুহম্মদ বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে আমার কিসের প্রয়োজন ? একজন অশ্বারোহী যেমন ক্ষণিকের জন্যে গাছতলায় দাঁড়ায় এবং পরক্ষণেই তা পরিত্যাগ করে, পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেইরকম।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, পবিত্র হাদীস শরীফে আছে, পৃথিবী আত্মম্ভরিতার স্থান এবং স্বর্গ সুখের স্থান। পৃথিবী বিশ্বাসীদের জন্যে কারাগার ও দুর্ভিক্ষ, যখন তারা পৃথিবী পরিত্যাগ করে তখন তারা যেন কারাগার এবং দুর্ভিক্ষ ত্যাগ করে। রেফিক উল্লাহ সংকলিত এবং সম্পাদিত হাদীস শরীফের বাংলা অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

মহাকবি মিলটন তাঁর প্যারাডাইস লস্ট নামক বিখ্যাত কবিতায় লিখেছিলেন, স্বর্গেদাসত্ব করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা শ্রেয়।

রবীন্দ্রনাথেরও স্বর্গ ব্যাপারটা সম্পর্কে যথেষ্ট অনীহা ছিলো বলেই মনে হয়। এক অবিস্মরণীয় প্রেমের কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা গড়িব না ধরণীতে। আর স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতায় তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, শোকহীন, হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন

চেয়ে আছে এবং শেষ বিচ্ছেদের ক্ষীণ লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে দেখা যাবে না।

ধর্ম এবং কাব্য নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা মোটেই নয় এবার আমরা স্বর্গসম্পর্কিত হাস্যকর উপাখ্যানে প্রবেশ করছি।

প্রথমে সেই গ্রাম্য বালকটির কথা বলি, যে তার বাবার সঙ্গে প্রথম একটা বড় শহরে বেড়াতে এসেছিলেন। সেই শহরে এসে সে জীবনে প্রথম বহুতল অট্টালিকা দেখে এবং লিফ্‌টে চড়ে। বাবার সঙ্গে লিফ্‌টে চড়ে সে যখন সর্বোচ্চ তলে দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছিলো, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে বাবাকে প্রশ্ন করে, বাবা, ভগবান কি জানে যে আমরা যাচ্ছি?

স্বর্গ বিষয়ে পরের কাহিনীটি এক গোঁড়া ক্যাথলিককে নিয়ে। ক্যাথলিক ভদ্রলোকটি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি করুণ কণ্ঠে পার্শ্বে উপবিষ্টা স্ত্রীকে বললেন, ওগো, তোমাকে একলা ছেড়ে যেতে আমার মন কেমন করছে। এই কথা শুনে সাধ্বী স্ত্রী কান্নার ভেঙে পডলেন। তখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদো না, এত সহজে মন ভেঙে ফেলো না। আমার একটা পরামর্শ শোনো।

পরামর্শের প্রস্তাব শুনে ভদ্রমহিলা কান্না একটু থামালেন। তখন ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে দুবার গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, দ্যাখো, আমি মরে যাওয়ার পরে তুমি আবার বিয়ে করো। এই প্রস্তাবে ভদ্রমহিলা আঁতকিয়ে উঠলেন, না, না। দুই স্বামীর কথা আমি ভাবতেও পারি না।

ভদ্রলোক তখন বললেন, আরে আমি তো আর একসঙ্গে দুই স্বামীর কথা বলছিনা। আমার মৃত্যুর পরে তুমি বিয়ে করছো। তোমার এখনো এক স্বামী রয়েছে, তখনো এক স্বামী থাকবে।

ভদ্রমহিলা অনেক চিন্তা করে বললেন, কিন্তু যখন আমরা সবাই মারা যাবো, তখন স্বর্গে গিয়ে তো আমার আবার সমস্যা দেখা দেবে। সেখানে আমার দুজন স্বামী হয়ে যাবে।

মুমূর্ষু ভদ্রলোক এবার সত্যিই চিন্তায় পড়লেন। এটা ভাববারই কথা, স্বর্গে তার স্ত্রীর তিনি ছাড়া আরো একজন স্বামী থাকবে এটা অকল্পনীয় এবং খুব অনৈতিক হবে। তিনি বেশ মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁর

মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেলো, তিনি স্ত্রীকে বললেন, ওগো, তুমি আমার মৃত্যুর পরে পাশের গ্রামের জন সাহেবকে বিয়ে কোরো। স্ত্রী অবাক হলেন, কেন জনসাহেবকে বিয়ে করলে সুবিধে কি? স্বামী বললেন, খুব সুবিধে। জনসাহেব যে ক্যাথলিক নয়। ওতো আর স্বর্গে যাবে না। তুমি পৃথিবীতে জনসাহেবের বৌ হবে, তারপরে মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়ে আবার আমারই বৌ হবে।

এই ক্যাথলিক ভদ্রলোকের মত স্বর্গ সম্পর্কে সকলের ধারনা কিন্তু এত পরিষ্কার নয়।

স্বর্গে যাওয়ার সহজ পন্থা এই বিরল শতকের শেষেও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। বহুকাল আগে ত্রেতা লংকেশ্বর দশানন সরাসরি স্বর্গে চলে যাওয়ার জন্যে সিড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর সেই স্বপ্ন সফল করে যেতে পারেন নি। তাঁর সেই মহান পরিকল্পনা পৌরাণিক প্রবাদে রাবণের সিঁড়ি নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। যদি রাজা দশানন সত্যি সত্যিই সিঁড়িটা বানিয়ে যেতে পারতেন এই ধরাধামের পাপীতাপীদের খুব উপকার হতো। তাঁদের আর খারাপ কাজ করে মৃত্যুর পরে কষ্ট করে নরকবাস করতে হতো না। তারা সোজা সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে চলে যেতেন।

অন্য একটা পুরনো গল্প আছে স্বর্গের সিঁড়ি নিয়ে। পৃথিবীর মানুষেরা একবার ঠিক করলো যে সবাই মিলে একসঙ্গে পরিশ্রম করে স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি বানাবে যাতে মর্ত্যলোক থেকে সিঁড়ি বেয়ে সকলেই স্বর্গে চলে যেতে পারে।

সেটা ছিলো পৃথিবীর আদিম যুগ। তখন ছিলো সব মানুষেরই এক ভাষা। মানুষে মানুষে তখনো ভাষার ব্যবধান তৈরি হয় নি। সিঁড়ি গাঁথার কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। আকাশ ফুঁড়ে স্বর্গের দিকে ক্রমাগত এগোচ্ছে সেই সিঁড়ি।

অবশেষে ভগবান কিংবা স্বর্গের দেবতারা প্রমাদ গণলেন। সর্বনাশ, কি সর্বনাশ! এই সিঁড়ি সম্পূর্ণ হলেতো দেবতা আর মানুষে, স্বর্গে-মর্ত্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। যে কোনো মানুষ সোজাসুজি স্বর্গে উঠে আসবে; কোথায় তখন থাকবে স্বর্গের পবিত্রতা।

অনেক ভেবে চিন্তে মহামান্য ঈশ্বর অবশেষে একটা বুদ্ধি বার করলেন। বলাবাহুল্য, কুট কচালে বুদ্ধির তাঁর কখনোই অভাব হয়নি। তিনি ভাষার সৃষ্টি করলেন। একেক গোষ্ঠি মানুষের মুখে একেকরকম ভাষা।

ফল দাঁড়ালো অতি ভয়াবহ। আগে যেমন সবাইয়ের কথা বুঝতে পারছিলো, সবাই নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি তৈরিতে সহযোগিতা করছিলো, অতঃপব তার আর সম্ভব হলো না।

সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপের লোক হয়তো চাইছে ইট; যেহেতু তাঁর ভাষা পরের ধাপের লোকের বোধগম্য নয়, সে এগিয়ে দিলো বালি। আবার এর পরের ধাপের লোক যখন বালি চাইছে তার নিচের ধাপের লোকেরা তাকে এগিয়ে দিলো চুন।

অনতিবিলম্বে দেখা দিলো চূড়ান্ত হৈ চৈ, গোলমাল, সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা। মানুষের স্বর্গের সিঁড়ির স্বপ্ন সেখানেই ভেস্তে গেলো।

সেই আদিম যুগ থেকে শুরু হয়েছে। মানুষের স্বর্গের স্বপ্ন চিরদিনই এই ডাবে ভেস্তে গেছে। আত্মকলহ এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝির অভাবে এই মর পৃথিবী থেকে স্বর্গ আজো বহুদূরে।

নন্দনবন ও পারিজাত কানন, রম্ভা ও উর্বশী, অমৃতরসের অধিকার থেকে মানুষ চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয়েছে।

অবশেষে এই স্বর্গ-নরকের সামান্য নিবন্ধটি একটি অবিশ্বাস্য গল্প দিয়ে শেষ করি। বলা বাহুল্য গল্পটি পরোপুরি আমার নয়, এর মুল কৃতিত্ব এক বিদেশি লেখকের।

মাত্র তিরিশ সেকেণ্ড আগে সুবিমলবাবু ইহালীলা সম্বরণ করেছেন। এরই মধ্যে তিনি পরলোকে এসে গেছেন। এত তাড়াতাড়ি তিনি সাধনোচিত ধামে পৌঁছে যাবেন একথা ইহজীবনে তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

সুবিবলবাবু চোখে খুলে দেখতে পেলেন সামনেই দেয়ালে একটা ঘড়ি ঝুলছে, এখন সময় কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা। এই তো আধ ঘণ্টা আগে সকাল দশটার সময় তিনি নিজের বাড়ির বাইরের ঘরে আরাম কেদারায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা দমবন্ধ

ভাব এবং তীব্র যন্ত্রণা, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যান। তারপরে ঠিক সাড়ে উনত্রিশ মিনিটের মাথায় তিনি অক্কাপ্রাপ্ত হলেন, এবং অবিলম্বে আধ মিনিটের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছেছেন।

স্বর্গের দূরত্ব পৃথিবী থেকে মোটেই কম নয়। পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি গ্রহ এবং তাদের চাঁদটাদ উপগ্রহ সমেত সূর্যের সৌর মণ্ডল। আবার অনেকগুলি সূর্যের অনেকগুলি সৌরমণ্ডল নিয়ে মহাসূর্যের মহাসৌরমণ্ডল। এখানেই শেষ হলে ভালো ছিলো। কিন্তু বিশাল তিমি মাছের পরে বিশালতর তিমিঙ্গিল তারো পরে তিমিঙ্গিলগিল যেমন আছে তেমনই মহাসূর্যের পরে আছে প্রমহাসূর্য, এই রকম ভাবে ক্রমশঃ প্রপ্রপ্র···মহাসূর্য, এই সব চাকার উপরে চাকা তার উপর চাকা ইত্যাদি। যেখানে শেষ হয়েছে তারো শেষে কিংবা শুরুতে রয়েছে পরলোক।

এই অনন্ত পথ মাত্র তিরিশ সেকেণ্ডে চলে এসে সুবিমলবাবু অতিশয় বিস্মিত হলেন, তার চেয়েও বিস্মিত হলেন একটি আধুনিক রুচিসম্মত, সুসজ্জিত পথে প্রবেশ করে। সুবিমলবাবু মনে মনে ভাবলেন, স্বর্গ জায়গাটা তাহলে এইরকম। সেই যে পারিজাতবন, নন্দনকানন ইত্যাদির কথা তাঁর শোনা ছিলো তার সঙ্গে খুব মিল নেই কিন্তু এই ঘরটা ভালো। ভগবান তাকে ভালো ঘরই দিয়েছেন স্বর্গ বাসের জন্যে।

সুবিমলবাবু একবার তাঁর সদ্য অতীত মানব জীবনের দিকে ফিরে তাকালেন। নিজের হাতে খুন করা ছাড়া পৃথিবীতে আর যত রকমের খারাপ কাজ করা সম্ভব জীবদ্দশায় তিনি তাঁর সবই করেছেন। তাঁর ছিলো সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, অর্থাৎ লোকে যাকে বলে, ইধারকা মাল উধার আর উধারকা মাল ইধার। জাল-জুয়াচুরি, পঞ্চ মকার, জীবনে দুপয়সা কামানোর জন্যে এবং নিজের তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্যে তিনি করেন নি বা করতে পারতেন না এমন কোনো কুকর্ম নেই।

সুবিমলবাবু কিন্তু তাঁর পার্থিব জীবনে একবারো ঘুনাক্ষরে কল্পনা করতে পারেন নি যে মৃত্যুর পরে তাঁর স্বর্গবাস হবে। চিরদিন তাঁর বিশ্বাস ছিলো ওসব স্বর্গফর্গনেহাৎ গাঁজাখোর মূর্খের আজগুবি চিন্তা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। স্বর্গও নেই, নরকও নেই, যা হবে তা পৃথিবীতে

জীবনকালেই হবে। মরে যাওয়ার পরো পুরো ব্যাপারটা একদম শূন্য, যাকে বলে ফক্কা।

কিন্তু এখন মৃত্যুর তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে সজ্ঞানে এই রকম একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করে সুবিমলবাবু বুঝতে পারলেন. স্বর্গ-নরক ব্যাপারটা মিথ্যে নয়।

দশটা তিরিশ মিনিটে অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় তিনি এই ঘরে প্রবেশ করেছেন, সামনের ডিসটেম্পার করা দেয়ালে ইলেকট্রনিক ঘড়িতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন দশটা বত্রিশ। মাত্র দু'মিনিট, এরই মধ্যে তিনি তাঁর লবণহ্রদের নবনির্মিত বাড়ির দোতলার ড্রয়িংরুম থেকে প্রমহা সৌরমণ্ডল অতিক্রম করে এখানে এসে গেছেন, এবং শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে একজন জাপানি গেইসা বালিকা নৃত্যরতা অবস্থায় তাঁর পদপ্রান্তে এক প্লেট মাংসের বড়া রেখে গেছে. আর একটি দক্ষিণী দেবদাসী বিলোল অঙ্গবিভঙ্গে এক বোতল হুইস্কি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

সব দিক থেকে সব ব্যবস্থাই সুবিমলবাবুর মনোমত। ঘরের দেয়ালে ফিকে নীল রঙের ডিসটেম্পার, একটা সুন্দর বিদেশি ক্যালেণ্ডার, ভিতরে একটি ছিমছাম মনিপুরী চাদরঢাকা নরম বিছানা, বিছানার পাশে টিপয়ে সুদৃশ্য কাঁচের গেলাসে জল। এপাশে জানলার ধারে একটা হাফ-ডেকচেয়ার, ভালো বেতের জিনিষ, আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না।

এখন আরাম করে এই ডেকচেয়ারে বসে গেলাসে একটু হুইস্কি ঢেলে নিয়ে সুবিমলবাবু ভাবতে লাগলেন একটু সোডা আর বরফ থাকলে ভালো হতো। যেমন চিন্তা তেমন কাজ, সুবিমলবাবু ভাববার মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে একটি মদালসা রক্ষী একটি নিঃশব্দ ট্রলির উপর রুপোর ট্রেতে সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে কয়েক বোতল সোডা আর একটা বরফের তাপ-নিয়ন্ত্রিত বাটি এনে রেখে গেলো।

ডেকচেয়ারে বসে অল্প অল্প চুমুক দিয়ে নিজের ঠোঁট আর গলাটা ভিজিয়ে নিলেন সুবিমলবাবু। মাংসের বড়ায় কামড় দিয়ে বুঝলেন এ জিনিষও অতি উপাদেয়, কোনো রকম ছাঁট বা চর্বি দিয়ে ভেজাল মাংসের

বড়া নয় প্রকৃতই ভালো নরম মাংস, এরকম জিনিষ ভালো জায়গায় অর্ডার দিলেও সচরাচর পাওয়া যায় না।

পৃথিবী থেকে এখান পর্যন্ত আসতে সুবিমলবাবুর কোনো পরিশ্রমই হয় নি, হাওয়ায় পাখির পালকের মত ভেসে তিনি চলে এসেছেন। কিন্তু এত দীর্ঘ দূরত্ব পলকের মধ্যে পাড়ি দিলেও কেমন যেন একটা মানসিক ক্লান্তি স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। আর তা ছাড়া মাত্র আধঘণ্টা আগের সেই হার্ট স্টোকের মর্মান্তিক আঘাত এবং যন্ত্রণা সুবিমলবাবু নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করার পরেও এখনো যেন অনুভব করতে পারছেন।

কিঞ্চিৎ পানভোজনের পরে সামনের খাটের উপরে পাতা বিছানায় গিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। আপাতত একটু বিশ্রাম দরকার। কোথা থেকে কোথায় এলেন, এখানে কি করবেন, কতদিন থাকতে হবে, এসব বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করার দরকার।

ঠাণ্ডা মাথা কথাটা মনে আসতে এবার সুবিমলবাবু মনে একটু খটকা লাগলো। মৃত্যুর পরেও এখন কি তাঁর মাথা আছে, তাঁর সেই চকচকে, গোলগাল, মসৃণ কুবুদ্ধি ভরা টাকওলা মাথাটা। হাত তুলে মাথায় দিয়ে তিনি স্পষ্ট সেটার অস্তিত্ব অনুভব করলেন। কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চ হলো তাঁর, তাহলে তিনি সশরীরে এখানে এসেছেন। এত দূর পথ এই ভারি শরীরটা নিয়ে সাবলীলভাবে চলে আসা সোজা কথা নয়।

এবার আসল চিন্তা শুরু হলো সুবিমলবাবুর। সামান্য কিছুক্ষণ আগে পৃথিবীতে ফেলে আসা তার সংসার, নিজের হাতে তৈরি গাড়ি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ব্যবসা, ধনদৌলত, ফষ্টিনষ্টি কোনো কিছুর জন্যেই তিনি এখন আর কোনো টান অনুভব করছেন না।

সুবিমলবাবু ঠিক করলেন এত দূরে এখানে যখন এসেই পড়েছেন, এখানেই নতুন করে সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। ধীরে ধীরে এই স্বর্গ জায়গাটাকে ভালো করে বুঝে নিয়ে কব্জা করতে হবে। যদি পার্টিশনের পর শূন্য হাতে এবং হাজারো দায়িত্ব কাঁধে নোয়াখালি থেকে কলকাতায় এসে বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা, প্রতিষ্ঠা সব আয়ত্ব করতে পারেন তবে এখানেও পারবেন।

কি ভাবে কি করলেন নানা রকম ভাবতে ভাবতে সুবিমলবাবু গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

বহুক্ষণ পরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙলো সামনের দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন দশটা বেজে চৌত্রিশ। সুবিমলবাবু ধড়মড় করে জেগে উঠলেন। সর্বনাশ! একটানা বারোঘণ্টা ঘুমোলাম নাকি?

এই প্রশ্নটা মনের মধ্যে জাগতেই এক ব্যক্তি, যাত্রাদলের প্রতিহারীর মত পোষাক তার, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং সুবিমলবাবুর চিন্তার সূত্র ধরে বললো, না, মোটেই বারো ঘণ্টা নয়, দশটা বত্রিশ থেকে দশটা চৌত্রিশ আপনি মাত্র দু'মিনিট ঘুমিয়েছেন, তার মধ্যে ঘুমোনোর আগে আপনি চল্লিশ সেকেণ্ড ব্যয় করেছেন চিন্তা করার জন্য। অর্থাৎ ঘুমের জন্য মোটমাট আপনার আশি সেকেণ্ড সময় গেছে।

সুবিমলবাবুর মুখমণ্ডলে প্রগাঢ় বিস্ময়ের ভাব দেখে প্রতিহারী বললো, আপনার পানীয়ের গেলাসে দেখুন, বরফ একটুও গলে না। বারো ঘণ্টা হলে বরফ গলে জল হয়ে যেতো।

অতঃপর প্রতিহারী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বিমূঢ় সুবিমলবাবুকে বললো, এবার আপনার আহারের আয়োজন করছি।

সঙ্গে সঙ্গে গেইশা, দেবদাসী ইত্যাদি দেবভোগ্যা রমণীরা সোনার থালায়, সোনার বাটিতে থরে থরে হাজার রকম সুখাদ্য এনে উপস্থিত করলো, সঙ্গে উত্তম সুরা ও মধুর পানীয়। তারা বিলোল ভঙ্গিতে পরিবেশনে ব্যস্ত হলো।

সুবিমলবাবু একটু আগেই কয়েকটা মাংসের বড়া খেয়েছেন। তবু ভালো খাবারের গন্ধে তাঁর আবার ক্ষুধার উদ্রেক হলো। তিনি যথাসাধ্য ভোজন করার চেষ্টা করলেন। অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর একটি সুন্দরী বালিকা হাত মোছার ধবধবে তোয়ালে এবং সুগন্ধি উষ্ণজল এনে নিজেই সুবিমলবাবুর হাতমুখ মুছিয়ে দিলো।

ক্রমাগত সুন্দরী রমণীর সাহচর্যে সুবিমলবাবু একটু বিহ্বল বোধ করছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সম্পূর্ণ অচেনা এই জায়গায় সন্ত এসে হুম করে কোনো রকম হঠকারিতা করে ফেলা বিপজ্জনক হতে

পারে। কেউ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, একটু ধীরেসুস্থে রয়েবসে এগোতে হবে।

এদিকে কিন্তু দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ কপালে উঠলো, এতক্ষণে দশটা ছত্রিশ হলো। মাত্র ছ' মিনিট। এরই মধ্যে বিশ্রাম, দীর্ঘ ঘুম, পানাহার সব হয়ে গেলো। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য।

সুবিমলবাবুর মনে আরেকবার সন্দেহের ভাব দেখা দিতেই সেই আগের প্রতিহারী এসে উপস্থিত হলো এবং বিনা প্রশ্নেই বললো, না, ঘড়িটা খারাপ নয়। মহাজাগতিক বৈদ্যুতিক চুম্বক সব কিছুর সঙ্গে ওকে চালাচ্ছে। ওটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক সঙ্গে বাঁধা আছে। ওটা যদি থেমে যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও থেমে যাবে।

প্রতিহারী আরো বললো, এখানে সময়টা একটু আস্তে কাটে বলে প্রথম প্রথম মনে হয়। আপনি যদি পান, আহার, বিশ্রাম বা ঘুম অথবা অন্য কিছু যদি ইচ্ছে করেন বলুন, তার আয়োজন করছি।

একটা লম্বা হাই তুলে সুবিমলবাবু বললেন, আর কত খাবো, ঘুমাবো। একটা কিছু করে তো সময় কাটাতে হবে। এতো লম্বা সময়।

প্রতিহারী বললো, করার মতো কিছু তো এখানে নেই। বলে সে নিঃশব্দে চলে গেলো।

বিরক্ত হয়ে সুবিমলবাবু আরেকটু সুরা পান করলেন, তারপরে আরো একটু। এইভাবে প্রচুর পান করে আবার নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

তারপর ঘুম থেকে উঠে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন দু মিনিটও যায়নি। এখন সবে দশটা চল্লিশ। সুবিমলবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন, এখানে কতদিন থাকতে হবে, এই দীর্ঘ সময় কি করে কাটবে ?

মনে প্রশ্ন জাগা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিহারী এসে উদয় হলো, বললো, কি হলো, ফুর্তিতে থাকুন। আরাম করুন।

সুবিমলবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আর কত আরাম করবো ? এখানে আমাকে কত দিন থাকতে হবে ?

প্রতিহারী ধীর কণ্ঠে বললো, চিরদিন। অনন্তকাল।

সুবিমলবাবু বিছানায় উঠে বসে সামনের শূন্য বোতল আর গেলাসটা

মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দিলেন। সে ছুটো তুলোর খেলনার মত মেঝেতে গিয়ে পড়লো, সামান্য শব্দ হলো না, ভাঙলোনা, চুরলোনা।

এতে তিনি আরো খেপে গেলেন, প্রতিহারীর দিকে ছুটে গেলেন। প্রতিহারী বাতাসের মত হালকা শরীর নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

পরাজিত সুবিমলবাবু গতিক সুবিধের নয় দেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, এর চেয়ে আমার নরকে যাওয়াই ভালো ছিলো।

সেই একই রকম মৃদু হাসতে হাসতে প্রতিহারী ঠাণ্ডা গলায় বললো এটাই নরক।

ফিক্‌ব্যথা

ভয়ঙ্কর বিপাকে পড়ে গেছি। পিঠে শিরদাঁড়ায় কি একটা টান পড়ে একেবারে বেকায়দায় পড়ে গেছি। যাকে মার্বেল খেলায় বলা হয় নট্ নড়ন-চড়ন নট ফট্ একেবারে ঠিক সেই রকম।

শরীরে একবার কোথাও একটা ব্যথা-বেদনা দেখা না দিলে বোধহয় বোঝাই সম্ভব হয় না যে এই সামান্য পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বার দেড়মনি শরীরে এত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। কাঁধ, ঘাড়, গলা এই তিনটে যে আলাদা-আলাদা, যে জায়গাটা ফুলে আছে সেটা ঘাড়, যেখানটা এইমাত্র টনটন করছিল সেটা কাঁধ আর মাথা ঘোরাতে গেলেই যেখান থেকে অসহ্য একটা টান পড়ছে ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত তাই হল গলা। এছাড়া উদর বক্ষ রয়েছে। রয়েছে বিশাল পিঠ। সর্বত্রই এক অবস্থা। একটি উত্তেজিত, উদ্বাস্তু শির আমার এত সাধের শরীরে মারাত্মক বিপ্লব

সৃষ্টি করেছে। শরীরের কেন্দ্রবিন্দুই বোধহয় স্থানচ্যুত হয়ে গেছে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছি না নিজের ইচ্ছায়।

এ সবই কিন্তু ঘটেছে অতি সাধারণ ভাবে। আজও বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে লোক তুলে, লোক নামিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে অনারারী কণ্ডাক্টর সার্ভিস দিতে দিতে অফিসে এসেছি। যথাস্টপে লাফিয়ে নেমে দ্রুতশ্বাস দোতলার সিঁড়ি টপকিয়ে, করণাধ্যক্ষের দৃষ্টির অগোচরে আলমারির আড়ালে-আড়ালে দক্ষ ক্ষিপ্রতায় ঠিক বারোটায় নিজের চেয়ারে পৌছে গেছি।

চেয়ারে বসেও কিছু অনুমান করতে পারি নি, কোটটা খুলতে গিয়ে হাত ওঠাতেই পিঠে একটা টান। প্রথমে কিছুই বুঝি নি, ভাবলাম এমনিই বুঝি। তারপরে আবার চেষ্টা করতেই, কিন্তু কে চেষ্টা করবে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠতে হলো। শরীরের মধ্যে না কি বাইরেই বোধহয় কি একটা শব্দ হলো—ঘচাং।

আমার নিজের বাঁ হাতটা আর আমার আয়ত্তাধীনে রইল না, কোনা-কুনি তীব্রবেগে গোল হয়ে একটা অর্ধবৃত্ত পরিক্রমা করে পাশের টেবিলের সহকর্মীর ফুলতোলা কাঁচের গেলাসটা তিন গজ দূরে মেঝেতে ফেলে দিল। তিনি মন দিয়ে কাজ করছিলেন, এ রকম আকস্মিক আক্রমণে বোধহয় ক্ষিপ্ত হয়েই তিনি আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, তারপর আমার মুখে কি দেখলেন কে জানে, একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

বিমূঢ় আমিও কিছু একটা কম হইনি, কিন্তু কিছুই অনুধাবন করতে পারছিলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাকে ঘিরে অফিসে চারদিকে একটা গুঞ্জন উঠলো। দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাকে দূর থেকে দেখে গেলেন। যাঁর গেলাস ভেঙেছি তিনি এবং তিনি ছাড়া আরেকজন সহকর্মী আমার আরেক পাশে বসেন, তাঁরা উঠে কোথায় চলে গেলেন, বোধহয় আত্মগোপনই করলেন।

এর মধ্যে আমার একটা টেলিফোন এলো। যিনি টেলিফোনের টেবিলে বসেন তিনি বেয়ারাকে ডেকে কি যেন ফিস ফিস করে বললেন, সে রাজি হল না, তখন তিনি নিজেই চেঁচিয়ে আমাকে ডাকলেন, 'নক্ষত্র-

বাবু, আপনার একটা টেলিফোন।' লক্ষ্য করলাম তিনি আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করছেন যদিও গতকাল শেষবেলা পর্যন্ত তুমি বলেছেন। তিনি আমাকে ডেকেই টেবিলের ওপর টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

আমি টেলিফোনটা ধরার জন্য উঠে দাঁড়াতে গেলাম। এবার ডান পা-টা হঠাৎ তীব্রবেগে সামনের দিকে উঠে গেল সেখানে হোয়াট-নটের ওপর কয়েকটা আর্জেণ্ট আর ইমার্জেন্সী ফাইল আমারই জন্যে অপেক্ষমান ছিল। সেগুলো গোলা পায়রার মত ঘরের চারদিকে উড়ে পড়লো আর আমি সশব্দে ধরাশায়ী হলাম।

আশ্চর্য এবং দুঃখের বিষয় একজন লোকও আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। বহু কষ্ট এবং যন্ত্রণাসহকারে টেবিলের পায়া এবং চেয়ারের হাতল আশ্রয় করে প্রায় পনেরো মিনিট কসরত করে চেয়ারে আবার বসতে গেলাম। যেভাবে চিরকাল চেয়ারে বসে এসেছি সেভাবে বসা গেল না। যথেষ্ট কায়দা করে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাতলের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলাম।

ততক্ষণে অফিস ঘর একেবারে ফাঁকা। সুদূর প্রান্তে বেরুনোর দরজার কাছে একটা নাতিবৃহৎ ভিড় হয়েছে। ওদিকে বারান্দায় একটা মাঝারি গোছের জটলা। সবাই কি সব ফিসফাস করছে, আমি যেই তাকাচ্ছি, অমনি সব চুপ।

আমি আজ সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল এই অফিসে রয়েছি। সামান্য একটা পেশী-সঙ্কোচনে এতগুলো বন্ধুমানুষ পর হয়ে গেল।

একটু পরে হরিশ্চন্দ্র চৌবে এল। হরিশ্চন্দ্র চৌবে আমাদের অফিসের সবচেয়ে সাহসী পিয়ন। একবার অফিসারের সঙ্গে ট্যুরে গিয়ে সে অণ্ডালের ডাকবাংলোয় একটা বনবেড়ালকে লাঠিপেটা করে মেরেছিল, গত রায়টের সময় সেই একমাত্র হিন্দুস্থানী পিয়ন যার জরুর (অর্থাৎ স্ত্রীর) অসুখের টেলিগ্রাম আসেনি। চৌবে আমার হাতদশেক দূর দিয়ে তিনটে টেবিলের ব্যবধানে দুবার খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে অফিস পারাপার হল। সম্ভবত পরীক্ষা করে দেখল আমি কোনরকম আক্রমণ-টাক্রমণ করি কিনা।

কিছুই ঘটলো না দেখে অত্যন্ত গর্বিত ও সাহসী মুখে সে একবার বারান্দায় আরেকবার বাইরের দরজায় সমবেত কর্মীদের দিকে তাকিয়ে আমার দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে এল। আর সেই মুহূর্তে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝাঁকুনি, আমার পিঠে, কাঁধে না মাজায়, সমস্ত শরীরে একটা ভূমিকম্পে আমার পিছন থেকে চেয়ারটা পাক খেয়ে দেড় ফুট শূন্যে উঠে গেল।

অপ্রকৃতিস্থ

মহমতি শেক্সপীয়ার তাঁর হ্যামলেট নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পাগলামি বিষয়ে কয়েকটি অবিস্মরণীয় উক্তি করে গেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো,

'এই যদি পাগলামি হয়
তবু এর মধ্যে পদ্ধতি আছে।'

অনুবাদ কথাগুলো একটু খটমটে শোনাল, মূল পংক্তিটি হলো,

'Through this be madness
yet there is method in it.'

সেক্সপীয়ার সাহেবের এই কথাটি কিন্তু যে-কোনো পাগলের পাগলামি সম্পর্কেই সত্যি পাগলামি হলেও, সব রকম পাগলামির মধ্যেই একটা রীতি ও পদ্ধতি আছে।

সেই পুরনো গল্পটাই ধরা যাক। যেটা আমি অন্য জায়গাতেও বলেছি।

এক পাগল তাঁর বাড়ির বারান্দায় বসে বালতির মধ্যে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন। বাসায় বাইরের একজন লোক বেড়াতে এসেছে। সে এই পাগলামি দেখে পরিহাস করে প্রশ্ন করলো, 'বড়দা, কটা মাছ ধরলেন?'

বড়দা এই প্রশ্নে অতিশয় লজ্জিত হয়ে জিভ কেটে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ। কি বোকার মত প্রশ্ন করছো? দেখছো না, ঘরের মধ্যে ফাঁকা বালতিতে ছিপ ফেলেছি, এর মধ্যে মাছ আসবে কি করে?' তারপর একটু থেমে অধিকতর লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'আসলে এটা আমার একটা পাগলামি, এই আর কি।'

এই ক্ষেত্রে পাগল নিজেও সচেতন আছেন যে তিনি পাগলামি করছেন।

আমার নিজের যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাতে দেখেছি এই ক্ষেত্রে যেমন তেমনি বহু ক্ষেত্রেই শ্রীযুক্ত পাগল মহোদয় যথেষ্টই বুঝতে পারছেন যে তিনি পাগলামি করছেন

তবে ব্যতিক্রমও দেখেছি।

আমার এক প্রতিবেশী ফাটকা খেলতে গিয়ে তাঁর যথাসর্বস্ব নষ্ট করেন। তিনি খুব শান্ত, শিষ্ট, ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর নাম ধরা যাক প্রশান্তবাবু। আমাদের এই প্রশান্তবাবু, হঠাৎ বিপাকে পড়ে পাগল হয়ে গেলেন অথবা পাগল সেজে গেলেন।

তাঁর পাগল সাজবার অবশ্য কারণের অভাব ছিল না। প্রচুর পাওনাদার, বাড়িওয়ালার কাছে দেড় বছরের ভাড়া বাকি, গলির মোড়ের দুই দিকের দুই মুদির দোকানদার দু'বেলা বাসায় এসে ঘুরে যাচ্ছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। অবশেষে ভাগ্যের পরিহাসে, সকলের অত্যাচারে অথবা নিজের ইচ্ছায় তিনি একদিন পাগল হয়ে গেলেন।

তাঁর এই পাগল হওয়ার কয়েকদিন পরে আমি নাইট শো সিনেমা দেখে বাড়ির লোকদের সঙ্গে ফিরছিলাম। দেখি গলির মোড়ে একটা ল্যাম্প পোস্ট বেয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার কঠোর চেষ্টা করছেন।

যদিও প্রশান্তবাবুর কাছে আমিও গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাবো, তবু হাজার হলেও বহুদিনের পুরনো প্রতিবেশী, সুখ-দুঃখে পাশাপাশি বহুদিন আছি। ওঁর এই অবস্থা দেখে আমার মায়া হলো। আমি প্রশান্তবাবুকে এই বিপজ্জনক কর্ম থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'করছেন কি? কোথায় উঠতে যাচ্ছেন?'

প্রশান্তবাবু চটে গিয়ে বললেন, 'এতো দেখছি সাংঘাতিক কথা মশাই। নিজের বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দেবেন না।'

'নিজের বাড়ি?' আমি একটু অবাক হলাম।

প্রশান্তবাবু বললেন, 'নিজের বাড়ি নাকি অন্যের বাড়ি। দেখছেন না দোতলায় উঠেছি। দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। ভুল করে জ্বালিয়ে রেখে বেরিয়েছি। এখন গিয়ে নিবিয়ে শুয়ে পড়বো।'

এই কথা বলে প্রশান্তবাবু ল্যাম্প পোস্টের মাথায় জ্বলন্ত বালবটার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললেন, 'ঐ তো আলো জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছেন না?'

'পাগলামি করে বিখ্যাত হয়ে লাভ কি?'

এইরকম একটা কথা অনেকদিন আগে মহামহিম শিবরাম চক্রবর্তী মহোদয় লিখেছিলেন।

কিন্তু একটা কথা তো সত্যি যে বহু বিখ্যাত ব্যক্তিই, বিশেষ করে কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী ইত্যাদি, তাঁদের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য বা মনীষার জন্যে যতটা প্রসিদ্ধ তার চেয়ে তাঁদের খ্যাতির অনেক বড় কারণ তাঁদের কোনো রকমের পাগলামি, উচ্ছৃঙ্খলতা বা উদ্দামতা, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজ-লভ্য নয়।

বহু প্রাতঃস্মরণীয় সাধক বা সন্ন্যাসী, গৃহস্থীয় মাপকাঠিতে উন্মাদ বলেই পরিগণিত হবেন। আমাদের সাধারণ অঙ্কের হিসেবের আওতায় তাঁরা আসেন না।

তবে তাঁদের ঠিক পাগলও বলা চলবে না। তাঁরা পাগলের থেকেও এককাঠি ওপরে।

স্কুলের মাষ্টারমশায় ক্লাশে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এখান থেকে চন্দননগর তেত্রিশ মাইল, সেখানে আমাদের পুরনো বাড়িতে আটটা ঘর, তার একটা ঘরে আমি শনিবার সকালে জন্মেছিলাম। বলো তো আমার বয়স কত?'

কোনো ছাত্রই এ প্রশ্নের উত্তর জানতো না, শুধু একজন ছাড়া। সে হাত তুলতে মাষ্টারমশায় বললেন, 'তা হলে তুমি বলতে পারবে আমার বয়েস কত?'

ছাত্রটি উৎসাহিত হয়ে বললো, 'পারবো স্যার।'

মাষ্টারমশায় বললেন, 'ঠিক আছে বলে ফেলো।'

ছেলেটি বললো, 'আপনার বয়েস আটত্রিশ।'

উত্তর শুনে মাষ্টারমশায় খুব খুশি হলেন। বললেন, 'একেবারে ঠিক বলেছো। কি করে বার করলে?'

ছেলেটি বললো, 'স্যার আমার ছোটকাকা আধ-পাগলা। তার বয়েস এখন উনিশ। সেটা ডবল করে আপনার বয়স বার করলাম আটত্রিশ।'

এই ছাত্রটির ছোটকাকার সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের পাগলামির যে ফারাক তার মতই দূরত্ব পাগল ও কবি, পাগল ও সাধকের মধ্যে।

সেক্সপীয়ার সাহেব অবশ্য পাগল প্রেমিক ও কবিকে একই পর্যায়ে ফেলেছিলেন। আমরা এই তালিকায় প্রেমিকের মধ্যে ঈশ্বর-প্রেমিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

এ নিবন্ধ এখানেই সমাপ্ত, শুধু দুটো খুচরো গল্প বাকি আছে।

[এক] জনৈক ভদ্রলোকের অসুখের পাগলামি ছিলো খারাপ জাতের বাতিক। তিনি কোনো কিছু না ফুটিয়ে খেতেন না। এমন কি আইসক্রীম খেতে ইচ্ছে হলে, সেটা বাসায় এনে উনুনে ফুটিয়ে তারপর খেতেন।

[দুই] এক মানসিক হাসপাতালে জনৈক দর্শক সুপারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনাদের এখানে কি স্ত্রী রোগী আর পুরুষ রোগীদের আলাদা করে রাখা হয়?'

এই প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে সুপার সাহেব বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তা রাখা হয়। আপনারা এদের যতটা অপ্রকৃতিস্থ মনে করেন, এরা ততটা অপ্রকৃতিস্থ নয়।'

'গন্ধে গন্ধে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মৌমাছি আসিলো রে
গত বসন্তে এত মৌমাছি
কোথায় ছিলো রে !'

সঙ্গীতরসিক পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ আপনারা কেউ কি এই গানটি জানেন, গাইতে পারেন ? নিশ্চয়ই না, কারণ, প্রধান এবং একমাত্র কারণ, আপনি অমুক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রী নন। কিন্তু আমি অমুক স্কুলের ছাত্র, এই গানটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুর-ছন্দ-তাল-লয় সমেত আমার মুখস্ত এবং শুধু আমার নয়, ঐ বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রই এই গানটি যে কোনো অবস্থায় যে কোনো স্থানে গাইতে পারেন। একদা বাল্যকালে আমাদের বহু কপালের ঘাম এবং আক্ষরিক অর্থে প্রহৃত শরীরের উৎসারিত রক্তের বিনিময়ে এই গানটি আয়ত্ত করতে হয়েছিল।

গানটি রচনা করেছিলেন আমাদের মহাকুমার এস-ডি-ও সাহেব এবং এতে সুর দিয়েছিলেন আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত, মাননীয় এস, ডি ও সাহেব আবার আমাদের বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভা ছিলো তাঁর। তিনি নিজে আশ্চর্য তিজেল হাঁড়ি বাজাতে পারতেন। অনেকে বলেন, তিজেল হাঁড়ি বাজানোর তিনিই প্রবর্তক। যাঁরা জানেন না তাঁদের অবগতির জন্যে বলি তিজেল হাঁড়ি কোনো বাদ্যযন্ত্র নয়, সামান্য সাধারণ রান্না করার হাঁড়ি। এই মৃৎ-পাত্রটি একটু বাঁদিকে কাৎ করে ধরে দু-হাতের বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে তিনি অপূর্ব ধ্বনি তরঙ্গ তুলতেন। তাঁর অফিসের টেবিলেও এবং এজলাসেও নাকি হাঁড়ি রাখা ছিলো, সময়, সুযোগ এবং মনের ভাব এলেই বাজাতেন।

অনেক সময় আনন্দের উৎসাহে জোরে বাজাতে গিয়ে ভেঙে ফেলতেন। মাসে প্রায় তিন কুড়ি হাঁড়ি লাগতো তার সেই যুগের ষাটটি ভালো মাটির হাঁড়ির দাম ছিলো অন্তত চার টাকা এবং চার টাকার দাম ছিলো এক মন চাল, চার আনা সোনা। এই অপব্যয় নিয়ে মহুকুমা শাসক মহোদয়ের গৃহিনীর অভিযোগের অন্ত ছিলো না, তিনি অবশ্য বুদ্ধিমতী ছিলেন, সরাসরি টাকার কথা তুলতেন না, আমার এক পিসিমা তাঁর খুব বন্ধু ছিলেন, তাঁকে বলতেন ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরো কুড়োতে কুড়োতে জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেলো।

মাননীয় মহুকুমা শাসক অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। অবশ্য অধিকাংশ গানই কোনো বহু প্রচলিত কবিতা বা গানের ছড়ায় রচিত হয়েছিলো।

দোলের সময়ই তাঁর বিখ্যাত গান ছিলো 'দে দোল দে দোল।' তিনি একটি আমগাছের ডালের সঙ্গে ঝোলানো দোলনায় বসে থাকতেন, সবাই মিলে দূর থেকে তাঁর গায়ে আবির ছুঁড়ে দিতো আর সেই রঙ্গীন হাওয়ার তিনি দোল খেতে থাকতেন। একবার দোল খেতে খেতে এবং একই সঙ্গে তিজেল হাঁড়িতে তাল দিতে গিয়ে তিনি উল্টে পড়ে যান। তাঁর নাক অল্প থ্যাঁতা হয়ে যায়।

অবশ্য সেটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নাকের ব্যথা ভুলে গিয়ে তিনি পহেলা বৈশাখের আনন্দে সঙ্গীত রচনায় মত্ত হলেন, আর সে কি গান, আমরা গুনে দেখেছিলাম একটা গানের মধ্যে তেত্রিশবার বর্ষ শব্দটি রয়েছে। যতদূর মনে পড়ছে এই অসামান্য গানটির প্রথম কয় পদ এই রকম ছিলো।

পশ্য পশ্য পশ্য পশ্য।
বর্ষে বর্ষে নব্য বর্ষ
হাস্য লাস্য ষস্য ভস্য
পশ্য পশ্য পশ্য পশ্য।

অবশ্যই সঙ্গীতরসিক পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারছেন তিজেল হাঁড়ির বোলের সঙ্গে এই সুরমহিমা কেমন প্রকটিত হয়ে উঠতো আমাদের মফঃস্বলী

আকাশ বাতাস ধ্বনিত মুখরিত হয়ে উঠতো নতুন বছরের সকালে। এর পর তিন দিন গৃহপালিত জীবজন্তু কুকুর-বিড়াল কি এক অহেতুক আতঙ্কে তক্ত-পোষের নিচে লুকিয়ে থাকতো, গরু, মোষ দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতো, গাড়ি সমেত ঘোড়া খানার মধ্যে লাফিয়ে পড়তো। কাক, চড়াই সব রকম পাখি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো।

আমাদের তখন বয়েস কম ছিলো, কানের পর্দা শক্ত ছিলো। এবং মাথাধরা কাকে বলে জানতাম না। এই সব আমাাদর ভালোই লাগতো কিন্তু সত্যিকারের কষ্ট হতো জানুয়ারি মাসে নতুন ক্লাসে উঠে ইস্কুল খোলার পর। ইস্কুল খোলার প্রথম দিন সবাইকে সমবেত ঐ প্রমমোক্ত গন্ধে-গন্ধে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গানটি গাইতে হতো। প্রথম সারিতে ঘুরেফিরে একশোজন তিজেল হাঁড়ি বাজাতে বাজাতে গাইতো, বাকিরা নিতান্ত খালি গলার। অত্যুৎসাহে অনেক হাঁড়ি ভাঙ্গতো বেসুরো বাজালে সহকারী প্রধান শিক্ষক মহোদয় যিনি নিজে এই গানটিতে সুর দিয়েছিলেন, তিনি অপরাধী হাঁড়িবাদককে আবিষ্কার করে তার হাতের হাঁড়ি লাঠি দিয়ে ভেঙ্গে দিতেন, এবং কানধরে মাঠের বাইরে নিল-ডাউন করিয়ে দিতেন।

তিজেল হাঁড়ি আমি কিছুতেই বাজাতে পারতাম না। ফলে প্রতি বৎসর নতুন ক্লাসে ওঠার হালখাতা হতো আমার নিউ-ডালন হয়ে। এখনো কারো হাতে মাটির হাঁড়ি দেখলে বুক শিউরে ওঠে।

কিন্তু আমাদের সেই সহকারী প্রধান শিক্ষক তিনি কি করে সেই হট্টতানের মধ্যে ভুল সুরের হাঁড়িটি ধরে ফেলতেন ভাবলে এখনো অবাক লাগে।

হেপি নিউইয়ার

নববর্ষের উৎসবের পরদিন সকালে একটি শিশু তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মা প্রতিদিন কেন নিউইয়ার হয় না ? প্রতিদিন আমরা কেন হ্যাপি নিউইয়ার করি না ?"

আমাদের 'হেপি নিউইয়ার' বলার ভদ্রলোকটি কিন্তু ঐ শিশু নন। তিনি সফল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত এক ব্যবসায়ী। যে বঙ্গজ উচ্চারণ দোষে তিনি দুষ্ট, সেই উচ্চারণ দোষ একদা আমার মধ্যেও ছিল, এখনও হয়ত আছে।

আমি সচেষ্ট ও সতর্ক হয়ে কিছুটা কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু সেই স্বদেশী বন্ধু এ নিয়ে মাথা ঘামান নি। তবে তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না, তিনি এ সবের পরোয়া করেন না বরং আমরাই মাঝেমধ্যে খটকায় পড়ি।

একেক সময় ধরাই কঠিন হয় তিনি ইংরেজীতে কি শব্দটা বলছেন। তার সঙ্গে আমার সবসময় যোগাযোগ থাকে না। তবু এখানে ওখানে কাজের বাড়িতে, উৎসবের মঞ্চে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। আমরা একই স্কুলের দু-এক ক্লাশ নিচে উপরে পড়েছি, জন্মেছিলাম একই মফঃস্বল শহরের একই পাড়ায়। ধনবান মানুষ হলেও তিনি আমার সম্বন্ধে কৌতূহল ও উৎসাহ দেখান সব সময়েই।

কয়েক মাস আগে একদিন দেখা। বললেন, "তোমার ফেটটা একটু বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে।" আমি ধরতে পারি নি, ভাবলাম বোধহয় তিনি বলতে চাইছেন যে আমার ভাগ্য এখন প্রসন্ন। কিন্তু কিছু পরেই বুঝতে পারলাম যে তিনি বলতে চাইছেন, আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি। ফেট মানে ইংরেজী Fate নয়, ফ্যাট (Fat) অর্থাৎ মোটা।

অবশ্য এই প্রথম নয়। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুবাদে তিনি বহুলোকের স্বনিযুক্ত, পরামর্শদাতা। একদিন এক বিয়ে বাড়িতে আমি প্যাণ্ট-শার্ট পরে

গিয়েছিলাম, ঐ ভদ্রলোক, নামটা বলেই ফেলি করুণাবাবু. তিনি বললেন, "তুমি পেণ্ট পরে বিয়ে বাড়িতে আসো কেন ? লেখক মানুষ বিয়ে বাড়িতে ধুতি পাঞ্জাবী পরে আসবে, তোমাকে মানাবে।" আমাকে কিসে মানাবে আর কিসে মানাবে না, তা নিয়ে আমি তেমন মাথা ঘামাই না, তবে পেণ্ট মানে যে প্যাণ্ট, এটা সেদিন হৃদয়ঙ্গম করতে আমার মিনিট দুই সময় লেগেছিল।

নববর্ষের সুবাদে এই করুণাদার প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আরেকটা অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা বলে নিই। অনেকদিন আগে উচ্চারণ নিয়ে বোধহয় কাণ্ডজ্ঞানে লিখেছিলাম। সেখানে এই প্রশ্নটা তুলেছিলাম। যে লোকটা ফ্যাটকে ফেট, ক্যাটকে কেট, স্ন্যাককে স্নেক বলে, সেটা কি তার জিহ্বার দোষ ? য-ফলা আকার সে কেন এ উচ্চারণ করে ?

কিন্তু আমি অনুধাবন করে দেখেছি, যে ব্যক্তি ট্যাপ রেকর্ডার বলে সেই বলে টেপ ওয়াটার। আসলে সে ট্যাপ আর টেপ দুইই চমৎকার উচ্চারণ করতে পারে, শুধু যেখানে যে রকম করা উচিৎ সেখানে সে রকম করে না। এ তার শিক্ষার অভাব না অভ্যাসের দোষ নাকি মানসিক বিশৃঙ্খলা ?

করুণাদার ব্যাপারটাই ধরা যাক। করুণাদা আগে পার্টনারশিপে ব্যবসা করতেন। যথারীতি বাঙালীর আর দশটা যুগ্ম বা যৌথ উদ্যোগের মত একদিন পার্টনারের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য দেখা দিল।

করুণাদার পার্টনারের নাম ছিল শ্যামবাবু। শ্যামবাবুও আমাদের দেশের লোক, তাঁকেও আমি জন্মাবধি চিনি। ফলে করুণাদা এবং শ্যামবাবুর ব্যবসায়িক কলহে আমাকে কিঞ্চিৎ মধ্যস্থতা করতে হয়।

সেই কলহের পরিণতি কি হয়েছিল সেটা এ কাহিনীর বিষয় নয়। সে আলোচনা এখানে করব না। তবে যে কারণে এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছি সেটা বলি।

কি একটা হিসেবে গোলমাল হয়েছিল। করুণাদার ধারণা হয়েছিল যে শ্যামবাবু বোধহয় কিছু একটা কারচুপি করেছেন। শ্যামবাবুর হয়ত কিছু দোষ ছিল, তিনি গুম হয়ে মাথা নিচু করে বসে করুণাদার গালাগাল

হজম করছিলেন। করুণাদা বারবার একটা কথাই বলেছিলেন, "ছিঃ ছিঃ! আপনার ওপর আমি এত বিশ্বাস করেছিলাম, এত আস্থা রেখেছিলাম। ছিঃ! ছিঃ! শ্যাম, শ্যাম, শেমবাবু!"

এই শেষোক্ত শব্দত্রয় নিয়েই আমাদের সমস্যা, 'শ্যাম, শ্যাম, শেমবাবু।' প্রথম শ্যাম শ্যাম হল শেম শেম (Shame, Shame) আর শেষের শেম-বাবু হল শ্যামবাবু। মোট কথা করুণাদা যখন বলছেন, 'শ্যাম শ্যাম শেম-বাবু', তখন তাঁর বলার কথা হল, 'শেম শেম শ্যামবাবু।'

এই কটুক্তি শ্যামবাবুকে কতটা লজ্জিত করেছিল তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কিন্তু আমার যে প্রশ্নটা তখন ছিল এবং এখনও আছে, করুণাদা পরিষ্কারভাবে শেম আর শ্যাম দুইই যদি উচ্চারণ করতে পারেন তবে শ্যামকে শেম আর শেমকে শ্যাম বলেন কেন?

জানি আমার এ সমস্যার সমাধান কোনদিন কেউ করতে পারবে না। সুতরাং শুভ নববর্ষে করুণাদার 'হেপি নিউইয়ার'-এ প্রত্যাবর্তন করি।

করুণাদা ব্যক্তিটি ভুল বা অমার্জিত উচ্চারণ করতে পারেন, কিন্তু তিনি নির্বোধ বা অশিক্ষিত নয়, তাছাড়া তিনি বিত্তবান। বিত্তবানের সর্বদাই সাতখুন মাপ।

নববর্ষের দিন সাতেক আগে করুণাদা আমাকে ডাকলেন। দেখি হাতে বিরাট এক লিস্ট, তাতে শহরের যত নামজাদা জ্ঞানীগুণী লোকের তালিকা। কবি, লেখক, আমলা, চিত্রতারকা এমনকি অধ্যাপক, উপাচার্য পর্যন্ত।

আমি বললাম, "কি ব্যাপার?" করুণাদা বললেন, "নববর্ষে বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছি, ভাবলাম তোমাকে একবার নামের লিস্টটা যাচাই করিয়ে নিই।" আমি সাধ্য ও বুদ্ধিমত দু-একটা নাম তালিকায় যোগ-বিয়োগ করলাম। তারপর পুরনো শুভানুধ্যায়ীর যা করা উচিত, একটু ভেবেচিন্তে করুণাদাকে বললাম, "দাদা একটা কথা।" করুণাদা বললেন, "কি কথা?" আমি বিনীতভাবে বললাম, "আপনি ইংরেজীটা পার্টির রাতে একটু কম বলবেন।"

নববর্ষের দিন গিয়ে দেখি একে একে বিশিষ্ট অভ্যাগতেরা আসছেন,

আর করুণাদা তাঁদের 'হেপি নিউইয়ার' বলে অভ্যর্থনা করছেন। আমি করুণাদাকে বললাম, "দাদা, হেপি নয়, হ্যাপি বলুন। লোকে কি ভাববে?" করুণাদা হেসে বললেন, "ছ্যাখো, তারাপদ, আমার ইংলিশ কেউ মাইণ্ড করবে না. যদি আমার স্কচ ভালো হয়।"

একটি চিঠি

বিড়ালের মালিকের নিকট হইতে ছাগলের মালিকের নিকট পত্র—

প্রিয় মহেন্দ্র (বোধহয়) বাবু,

প্রথমেই আপনার নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি, এই দীর্ঘকাল আপনার প্রতিবেশী থাকিয়াও আপনার নাম সত্যিই আমার জানা উচিত ছিলো, কিন্তু আপনার ছাগলগুলির নাম যদিও মোটামুটি জ্ঞানগম্য হইয়াছে আপনার নাম সম্যক জ্ঞাত নহি। ইহার প্রধান কারণ যদিও আপনার ছাগলগুলিকে ডাকিবার জন্য আপনি রহিয়াছেন, অদ্যাবধি কাহাকেও দেখি নাই যে আপনাকে ডাকিতেছে। ভোটার লিস্টে আমার নামের পূর্বেই আপনার নাম ছিলো, তাহাও অনেকদিন হইল, সুতরাং স্মৃতিশক্তি যদি এই প্রসঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করে, ক্ষমা করিবেন।

আজ কিছুদিন হইল আপনার আত্মীয়া (সম্ভবতঃ আপনার স্ত্রী-ই হইবেন) সময়ে-অসময়ে, অসময় বলিতে খর-মধ্যাহ্ন হইতে বর্ষণমুখর গভীর নিশীথ সকলই বুঝাইতেছি, আমাদের সর্বশ্রীনিবাসের দিকে মুখ করিয়া, কখনো বা অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া অসম্ভব নাকী অথচ অসাধারণ উচ্চস্বরে কি সব অভিযোগ করিয়া থাকেন। অভিযোগগুলি নানা ধরণের, আমাদের জামগাছের নোংরা ছায়া পড়িয়া আপনাদের উঠান অন্ধকার হইয়া

থাকে হইতে আমরা বেতন দিব না বলিয়া বোবা ভৃত্য নিয়োগ করিয়াছি এবম্বিধ বহুকিছুর মধ্যে আমাদের করবী নামক বিড়ালছানাটির সম্পর্কে অনুযোগই খুব বেশী হইয়া থাকে বলিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জানাইতেছে। সে আপনার আত্মীয়ার বক্তৃতাবলীর উৎসাহ ও একনিষ্ঠ শ্রোতা। এবার আমাদের আমসত্ত্ব এবং কাসুন্দি রৌদ্রে শুকাইতে কাকের অত্যাচার যে বেশী সহিতে হয় নাই তাহার কারণ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ধারণা আপনার আত্মীয়ার অবিরাম বাক্য-ঝঙ্কার। আমাদের উদ্দেশে নিবেদিত এই বাক্যবাণে দরিদ্র কাকগুলি তাহাদের স্বাভাবিক উঞ্ছবৃত্তি হইতে নিরত হওয়ায় মূলতঃ আমাদের উপকারই হইয়াছে।

কিন্তু নিরীহ বিড়ালশাবকটির বিরুদ্ধে আপনার আত্মীয়ার গঞ্জনাসমূহে আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ বোধ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে বাধ্য হইয়াই আপনার ছাগলগুলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি।

আমাদের বিড়ালছানা মাত্র একটি এবং চিরদিনই একটি থাকিবে, কেননা করবী একটি হুলোবিড়াল। কিন্তু আপনার ছাগলে সংখ্যা কত? আমি আঙ্কশাস্ত্রে পারঙ্গম নই, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি গণিতবিদ্যায় পারিবারিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকার না পাইয়া থাকে তবে তাহার গণনা মতে আপনার পোষা ছাগলের সংখ্যা আনুমানিক একত্রিশ হইতে চৌত্রিশের মধ্যে। তাহাদের ব্যা-ব্যা ব্যাকুলতা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর পক্ষে কতটা রম্য তাহা বলিতে চাহি না তবে তাহাদের উদগ্র ক্ষুধায় আররা সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছি। ছাগল কি কি খায় সে প্রসঙ্গে আপনাকে স্বর্গীয় সুকুমার রায় মহোদয়ের 'হযবরল' গ্রন্থটি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং তৎসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র তালিকা যোগ করিতেছি :

(১) প্রতিবেশীর গৃহের দ্বিতলের কার্নিশে উঠিয়া তাহার রেডিয়োর এরিয়েল।

(২) শালগ্রাম শিলা, আমাদের পরমারাধ্য গৃহদেবতাকে আপনার একটি ছাগল, প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, একেবারে না চিবাইয়া সোজাসুজি গিলিয়া ফেলিয়াছে।

(৩) প্রতিবেশীর মুক-বধির গৃহভৃত্যের লাল রঙের মোটরের টায়ারের মোটা চটি।

(৪) প্রতিবেশীর নিদ্রিত কুকুরের লেজের অর্ধাংশ, ছাগলের হাত হইতে (অথবা পা অথবা মুখ হইতে) গৃহ রক্ষা করিবে আশা করিয়া বিলাতি কুকুর খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম, সে এখন লেজের ঘা শুকাইতে ব্যস্ত এবং ছাগল দেখিলেই করুণ আর্তনাদ করে। যাহা হউক আমাদের করবীর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ দুইটি নাকি এইরূপ ঃ

(১) করবী করে আপনাদের মশারি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে করবী আমাদের মশারি কখনো ছেঁড়ে নাই, আপনাদের মশারি কেন ছিঁড়িল। আপনার আত্মীয়া-বর্ণিত শক্ত নতুন মশারি ছিন্ন করা এই ক্ষুদ্র বিড়ালশাবকের সাধ্য নহে, আমাদের ধারণা, আপনাদের মশারি পূর্বেই ছেঁড়া ছিলো করবী উহা আবিষ্কারের কৃতিত্ব বড়জোর লাভ করিতে পারে।

(২) করবী কবে আপনাদের এক কড়াই গরম দুধ পান করিয়াছে এবং পান করিবার পর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে আমাদের এক আত্মীয়া বহুকাল আগে পাচকের সঙ্গে কলহ করিতে করিতে উন্মত্তা হইয়া যান এবং ক্রোধবশতঃ আছড়াইয়া একটি লোহার কড়াই ভাঙ্গিবার চেষ্টা করেন, সেই সময় আমরা দেখিয়াছি লোহার কড়াই ভাঙা কত অসম্ভব। যাহা মানুষের অসাধ্য তাহা কত অসম্ভব। যাহা মানুষের অসাধ্য তাহা বিড়ালশিশুর পক্ষে কিরূপে সাধ্য হইতে পারে। তদুপরি উষ্ণ দুগ্ধ এক কড়াই পরিমাণ! ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভব?

অতঃপর মহাশয়, ছাগলের শৃঙ্গ আছে, ছাগল নিরামিষাশী ইহাই শুধু ছাগল এবং বিড়ালের মধ্যে পার্থক্য নহে। ছাগল দুগ্ধ দান করে, মাংস দান করে, ছাগলের চর্ম হইতে পাদুকা এবং শৃঙ্গ হইতে চিরুনি নির্মিত হয়। অপদিকে বিড়াল তাহার শাবক ছাড়া আর কাহাকেও দুগ্ধ দান করে না, (করবীর আবার সে ভরসাও নাই)। শুনিয়াছি ইঁদুর ধরিয়া থাকে, তবে এ পাড়ায় ইঁদুর একটিও নাই। বোধহয় আপনার ছাগলগুলির পেটেই

গিয়াছে। ইহার পর একটি বিড়ালশিশুর সহিত ত্রিংশোর্ধ ছাগলের কোনো তুলনাই সম্ভব নহে।

যথাযথ ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করিবেন। নতুবা অবিলম্বে আমাকে ব্যাঘ্র অথবা ঈগল পুষিবার লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে।

ইতি—

পোষা কুকুর

একটা কুকুর আজ কিছুদিন হলো আমাকে পুষছে।

এই পংক্তিটি পড়ে নিশ্চয়ই কেউ কেউ অবাক হচ্ছেন কেউ কেউ ভাবছেন, 'মুদ্রণ-প্রমাদ কিংবা লেখার ভুল। কিংবা লেখকেরই হয়তো বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, তাই এই রকম উল্টোপাল্টা লেখা হচ্ছে, সামনের সংখ্যা থেকে এই পৃষ্ঠাটা আর পড়বো না।'

কিন্তু এরকম ভাবার কোনো মানে হয় না! এই ফাঁকিবাজ লেখক তার সামান্য জীবনের হাজার হাজার শব্দ না ভেবে চিন্তে, পরিনাম চিন্তা না করে উল্টোপাল্টা লিখেছে, কিন্তু উপরের ঐ প্রথম পংক্তির সাতটি শব্দ সে সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বিনা প্ররোচনায় সম্পূর্ণ বুঝেসুঝে লিখেছে, লিখেছে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে।

একটা কুকুর আজ কিছুদিন হলো আমাকে পুষছে। কিছুদিন মানে আজ বিশে জুলাই তারিখ, আজকে পাঁচ মাস পাঁচদিন হলো, পনেরই ফেব্রুয়ারি থেকে আমার এই অবনতির আরম্ভ। তারিখটা ভুল হওয়ার উপায় নেই। ক্যালেণ্ডারে আমার ছেলে লিখে রেখেছে ঐ তারিখের পাশে আজ কুকুর ছানা এলো।' এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তত্তব বাংলায় চালো বোঝানো যায় না লেখা উচিত ছিলো।

'অন্ত সারমেয় শাবকের আগমন।'

আমার এই পোষমানার কাহিনী এক শীতের সকালে শুধু। অবশ্য তার আগে একটু ব্যাপার আছে। আমাদের পাড়ায় আশেপাশে খুব চুরি হচ্ছিলো। 'কথায় কথায়' যাঁরা নিয়মিত পাঠ করেন (আছেন কি ভূসংসারে তেমন কেউ সুরসিক?) তাঁরা জানেন আমাদের বাড়িতেও দু-একটা ছোট চুরি হয়ে যায়। অনেকেই পরামর্শ দিলেন, 'বাড়িতে একটা কুকুর পোষো।' আমার বাড়ির বাইরের দরজায় সর্বদাই চার-পাঁচটি কুকুর শুয়ে থাকে, এর সঙ্গে তিন ধাপ সিঁড়িতে পাঁচজনের বেশি জায়গা হয় না, বাকি সাত-আটজন দুঃখিত মুখে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়ায় অথবা কাছেই ফুটপাথে কোথাও চোখ বুজে পড়ে থাকে। এরা ঠিক আমার পোষা কুকুর নয়, এদের আমি কচিৎ কখনো ভাত-ডাল বা বাসি রুটি ছুঁড়ে দিই। মূলত এরা এদিক-ওদিক থেকে দৌড়োদৌড়ি করে খাবার জোগাড় করে আমার সিঁড়িতে শুধু বিশ্রাম নেয় ও ঘুমায়। কিন্তু এই সামান্য ব্যবস্থার জন্যেই তাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমি যখন বিকেলে বাড়ি ফিরি এরা দূর থেকে দেখে মোড়ে ছুটে যায়, তারপর আট-দশজনে মিলে আমাকে গার্ড অফ অনার দিতে দিতে বাড়িতে নিয়ে আসে।

কিন্তু এরা তো বাড়ির বাইরের দিকে থাকে। বাড়ির ভিতরে এদের প্রবেশ নিষেধ, এরা রাস্তার নোংরা কুকুর। আর চোর আসে বাড়ির ভিতরে, পিছনের দেয়াল টপকে। সুতরাং অন্দর-মহলের জন্য একটি স্বতন্ত্র কুকুর চাই আর সেটা রাস্তার নেড়ি কুকুর হলে চলবে না।

ফলে এক শীতের সকালে হাতীবাগানের কুকুরের বাজার, নিউমার্কেটের কুকুরের বাজার, সব জায়গা ঘুরে ফিরে অবশেষে ময়দানে কেল্লার দরজায় সামনের মাঠে এক সন্দেহজনক চেহারার লোকের কাছ থেকে একটি কুকুর ছানা কিনলাম। কুকুরছানাটির চেহারা কিন্তু সন্দেহজনক নয়, সে তার ভাইবোন, বাবা-মা সকলের সঙ্গে গলায় দড়ি নিয়ে ছাগলের মত খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিলো। চমৎকার লোমে ঢাকা কুকুরছানা, ঝোলা কান, চোখ দুটো নীলচে, বিক্রেতা অভয় দিলো, 'নিয়ে যান বাবু খাঁটি শিকারি কুকুর।' কেমন সংশয় ছিলো এমন তুলতুলে চেহারা কি করে শিকারি

কুকুর হবে, কিন্তু ততক্ষণে বাচ্চাটা আমার কোলে উঠে বসেছে এবং আমার মায়া হলো। সেই মায়াই আমার কাল হয়েছে এবং আমার সংশয়ও কেটে গিয়েছে।

পাঁচ মাসের মধ্যে সেই কুকুরছানার সমস্ত লোম ঝরে গেলো, চোখের নীলচে ভাব কেটে গেছে। এখন একটা দশাসই চেহারার কুকুর আমাদের তিন ঘরের ছোট বাড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আলনা থেকে কাপড় নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। জুতো-চটি বলতে কিছু নেই, শুধু আমাদের নয় বহিরাগতদের, ইতিমধ্যে একজন অসতর্ক কবির একটি পোর্ট-ফোলিও ব্যাগের এক-তৃতীয়াংশ সঙ্গে তিরিশ চল্লিশটা কবিতা, এক দূরসম্পর্কের পিসেমশায়ের চশমা খাপ এবং প্রাণের বন্ধুর সদ্য কেনা নতুন চটির বা পাটির অগ্রভাগ, এই কুকুরটি (যার নাম দিয়েছি আমরা ইংরেজিতে ছিলি বাংলায় লঙ্কা) গলাধঃকরণ করেছে। সকলের চোখের সামনে পাশে বসে সে এই কাজগুলি নিঃশব্দে করেছে, যখন চোখে পড়েছে তখন আর্তনাদ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। আজ কয়েকদিন হলো তার খেলার প্রধান উপকরণ হয়েছে আমার অতি প্রয়োজনীয় একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা অভিধান।

বাধ্য হয়ে কর্পোরেশন থেকে পুরনো মালের নিলামের সময় একটা মই কিনে এনেছি, অফিসে যাওয়ার জুতোজোড়া বিকেলে বাড়ি ফিরে মই বেয়ে বেয়ে উঠে ভেন্টি-লেটরের মধ্যে রেখে দিই, না হলে পরদিন খালি পায় অফিস যেতে হবে। জামাকাপড় সব আলমারিতে তালা দিয়ে রাখি শুধু টেলিফোনটা আলমারিতে রাখা সম্ভব নয়, গতকাল বিকালে একবার অনেকদিন পরে যন্ত্রটা ক্রিং ক্রিং করে উঠেছিলো আমরা ছুটে এসে ধরবার আগেই টেলিফোনের এই অস্বভাবিক আচরণ এক থাবার আঘাতে চিলি ক্ষান্ত করে দিলো। যাক বাঁচা গেলো, আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু স্বস্তি কোথায় পাই। একদা, মানে মাত্র পাঁচ মাস আগে, সকাল সাড়ে সাতটা, আটটা পর্যন্ত ঘুমোতাম। এখন সকাল চারটের মধ্যে চিলি তোষক ধরে হিঁচড়ে নামিয়ে আনে, তারপর শুরু হয় বাঁচার লড়াই।

দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে অর্থাৎ এবার দরজা খুলে বাইরে নিয়ে চলো। বড় বাইরে না ছোট বাইরে কে জানে, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে দে ছুট। চিলি ছুট দেয় তার পিছনে আমি ছুটি। আমার সেই স্ফীত মধ্যদেশ. নয়নমনোহর স্বাস্থ্যশ্রী আর নেই, ছুটে ছুটে হাড়গিলে পাখির পালকের মত চেহারা হয়েছে। লেক, সাদার্ন এভিনিউ কোনো কোনো দিন এমনকি ঢাকুরিয়া, যাদবপুর হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরি। ফিরে এসে আটটার সময় দুধের সঙ্গে একটা ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিই চিলিকে। এই সুযোগে স্নান খাওয়া করে অফিস চলে যাই। স্ত্রী-পুত্র-ভ্রাতা দেড়তলার মেজানিনে আশ্রয় নিয়েছে, যথাসম্ভব সেখানেই থাকে। চেয়ার ছিঁড়ে ঘুম ভাঙার পর থেকে চিলি তাণ্ডব করে বেড়ায়। আমি ফিরে আসা মাত্র আমাকে ধাক্কা দিয়ে মেজেতে ফেলে দিয়ে আমার বুকের উপর উঠে বসে ঘাড়টা কামড়িয়ে ধরে।

যারা দেখেন, সবাই বলেন, 'এ রকম সাংঘাতিক কুকুর পোষেন কেন?' আমি বলি 'সর্বনাশ! কি বলছেন, আমি ওকে পুষিনি ও আমাকে পুষছে'।

নববর্ষ

আর মাত্র কয়েক বছর। তারপর মহাকালের গহন অরণ্যে বঙ্গাব্দ নামে চিহ্নিত বৃক্ষটির চতুর্দশ হলুদ পাতাটি হাওয়ার মধ্যে ঝরে পড়ে যাবে।

কবির সেই মর্মান্তিক কবিতা, আজি হতে শতবর্ষ পরের পৃথিবী; যেখানে কবি দক্ষিণদ্বার খুলে বাতায়নে বসে শতবর্ষ আগের সেই ১৩০০ সালের (প্রকৃত তারিখ ২রা ফাল্গুন, ১৩০২) পুষ্পরেণুগন্ধ মাখা দক্ষিণ সমীরের স্পর্শ পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের কাছে; নববর্ষ আর নববসন্ত

জড়ানো শতাব্দী প্রাচীন স্মৃতি সম্ভার, 'আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে ধ্বনিত হউক ক্ষণ তরে, হৃদয়স্পন্দনে তব। ভ্রমরগুঞ্জনে নব পল্লব মর্মরে…।'

এর বহুকাল পরে অন্য এক অর্বাচীন পদ্যকার লিখেছিলেন,

'নববর্ষের আহ্লাদ সবই বুঝি বাড়াবাড়ি।'

* * *

আমার নিজের জন্ম বছরের প্রথম দিনে। কিন্তু সে তারিখটা পয়লা বৈশাখ বা পয়লা জানুয়ারি নয়। এমনকি পারসিক নওরোজ বা ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের ড্রাগন নাচে মুখর চিনে নববর্ষ নয়।

আমি জন্মেছিলাম পঞ্চাশ বছর আগের এক পয়লা অঘ্রাণে। আদি হিসেবে (অবশ্য আমায় জন্মের ঢের ঢের আগের ব্যাপার সেটা) অঘ্রান মাসটাই ছিলো বছরের প্রথম মাস। অঘ্রান মানে অগ্রহায়ণ, এই সংস্কৃত নামকরণের অর্থই হলো হায়নের অর্থাৎ বছরের অগ্রের মাস অর্থাৎ প্রথম মাস। আর সেই প্রথম মাসের প্রথম দিনে জন্মানোর সুবাদেই আমি অবশ্যই দাবি করতে পারি যে কোনো এক শুভ নববর্ষেই আমার জন্ম হয়েছিল।

শুরু করেই প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি। বাংলা নববর্ষে প্রত্যাবর্তন করি।

আমাদের অল্প বয়েসে বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনো নতুন বছরের উৎসবই আজকের মত এমন সার্বজনীন ছিলো না। কলকাতার কথা বলতে পারবো না, আমার শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের ওপারে বাংলাদেশের যে সামান্য মফঃস্বল শহরে সেখানে না ইংরেজি নতুন বছর না বাংলা নতুন বছর, দৈনন্দিন চিরাচরিত জীবনযাত্রায় কোনোটাই রেখাপাত করতো না।

বলা উচিত এবং স্পষ্টই মনে পড়ছে নববর্ষের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ছিলো পৌষ সংক্রান্তি কিংবা সরস্বতী পূজো অথবা মহরম।

পৌষ সংক্রান্তির আলপনা, নতুন ধান আর পিঠে পরমান্নের স্বাদ ও স্মৃতি এখনো অম্লান। সরস্বতী এবং লক্ষ্মীপূজোর কথাও বেশি করে মনে পড়ে। কারণ এ দুটোতেই ফুল, দুর্বো থেকে বিভিন্ন রসদ সংগ্রহে ছোটোদের ভূমিকা কিছু কম ছিলো না। কিন্তু নববর্ষ?

ইংরেজি নববর্ষের কোনো স্মৃতি আমার মনে নেই। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পরে দুই ঘোড়ার পালকি গাড়িতে চড়ে মায়ের সঙ্গে চলে যেতাম শহর থেকে দশ মাইল দূরে মামার বাড়িতে। তারপর স্কুল খুলে পড়াশুনো ঠিকমত আরম্ভ হওয়ার পরে ফিরে আসতাম। এর মধ্যে চলে যেতো বড়দিন, নিউ ইয়ার, যত সব সাহেবী উৎসব, আমরা কিছুই টের পেতাম না। শীতের ঘন ঠাণ্ডায়, নীল কুয়াশা ভরা রাতে উষ্ণ বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে মায়ের কোলের কাছে ঘুমিয়ে আমাদের রাত কেটে যেতো, আর দিন কেটে যেতো সোনালি রোদের উষ্ণতায়, পাকা ফসলের গন্ধে ভরা আমাদের সেই সব দিনরাত। সব স্পষ্ট মনে আছে মনোরম সেই স্মৃতিমালা কিন্তু তার কোনোখানে নববর্ষ বা ইংরেজি নিউ ইয়ার নেই।

আর বাংলা নববর্ষ? শুভ পহেলা বৈশাখ?

কিছুই মনে পড়ছে না। কোথাও তার কোনো স্মৃতি নেই। হয়তো ইস্কুল ছুটি থাকতো। সেটাও ভালো করে খেয়াল হচ্ছে না। আম্রপল্লব অথবা সচন্দন গন্ধপুষ্প, এমনকি নব বস্ত্রের কথাও মনে পড়ছে না। পূর্ব-বঙ্গের সেই প্রত্যন্ত মহকুমা শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনে বাংলা নতুন বছরের কোনো প্রভাবই হয়তো পড়তো না, অন্তত আমাদের সংসারে, আমাদের এলাকায়।

একটা কথা মনে আছে। অনেক দোকানে ঐ দিন কিংবা ওরই কাছাকাছি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হালখাতা হতো। পিতৃ-পিতামহের হাত ধরে হালখাতার দিনে দোকানে গেলে কিছু মিষ্টিমুখ হতো, সেটাও ক্ষীণ মনে পড়ছে।

আর মনে পড়ছে হরি পাগলের মেলার কথা। ঠিক পয়লা বৈশাখ নয়, হরি পাগলের মেলা বসতো বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবারে।

আমাদের শহরের উত্তর প্রান্তে ছিলো আকুরটাকুর এইরকম আশ্চর্য নামের একটা আধা শহুরে গ্রাম। সেই আকুরটাকুরের চৌমাথায় একটা ছোট টিনের ঘরের মন্দিরের চারপাশে এবং সামনের খোলা মাঠে বসতো সেই মেলা।

মেলায় অবশ্য ক্রয়দ্রব্য ছিলো জুঁই ফুলের মত ফুরফুরে সুগন্ধে ভরা

হালকা বিন্নি ধানের খই আর চিনির রঙীন মঠ, যাকে বলা হতো সাজের মিষ্টি। খেলার পরে বেশ কয়েকদিন আমাদের সকালে-বিকালের জলখাবার ছিলো ঐ বিন্নি ধানের খই আর চিনির তৈরি মঠ।

এই সূত্রে এখানে বলা উচিত যে বিন্নি ধানের খই আর কাগমারির দইয়ের ছন্দময় ছড়ায় বিখ্যাত কাগমারি গ্রামটিও ছিলো আমাদের শহরের আরেক পাশে। আকুরটাকুর যেমন ছিলো উত্তর প্রান্তে তেমনিই কাগমারি ছিলো শহরের পশ্চিম প্রান্তে একটা ছোট নদীর ওপারে।

কাগমারি আর আকুরটাকুরের এই পুরনো স্মৃতিকথা আপাতত অসমাপ্ত থাক। শুভ নববর্ষ অথবা পহেলা বৈশাখের স্মৃতি কোথাও না থাক তবু মনের মধ্যে কোথাও বসন্ত শেষের আর সন্থনিদাঘের সীমানায় একটি রক্তোজ্জ্বল অশোক গাছের ছবি আছে। পয়লা বৈশাখেরই কাছাকাছি কোনো সময়ে অশোক ষষ্ঠী বলে একটা ব্রত ছিলো। শুধু সেই ব্রতের জন্যে নয়, আমাদের বাড়ির বাইরের উঠোনে প্রাচীন এক অশোক গাছ শীত ফুরনো মাত্র তার রক্তজীবন পসরা নিয়ে আমারে সব শূণ্য পূর্ণতা করে দিতো।

সারাদিন মৌমাছির অবিশ্রান্ত গুঞ্জন। উঠোনের ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে ঝরে পড়া কাঠ-চাঁপার ফুল আর আমের মুকুল। বাতাসে ক্ষীণ সৌরভ ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সামনের পুকুরের কালো জলে জোনাকির ছায়া পড়েছে, পুকুরের পাশ দিয়ে লণ্ঠন নিয়ে কে যেন হেঁটে আমাদের বাড়ির দিকে এলো, উঠোনের টিনের গেট পার হয়ে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'রাঙা বৌদি, এবার নতুন বছর কবে আরম্ভ হচ্ছে ?'

পুনশ্চঃ

এই লেখাটা বড় সাদামাটা হয়ে গেলো। অন্ততঃ একটা হালকা গল্প বলি।

নববর্ষ মানেই উৎসব, উৎসব মানেই দেয়ানেয়া, উপহার। নববর্ষে এক স্বামী তাঁর স্ত্রীকে একটি মুক্তোর মালা উপহার দিয়েছেন। স্ত্রী পেয়ে খুবই খুশি হয়েছেন। তবু বললেন, 'আমি তোমার কাছে চাইলাম রঙীন টিভি

সেট. তার বদলে তুমি আমাকে মুক্তোর মালা দিলে।' স্বামী ঠোঁট টিপে বললেন, 'কি আর করা যাবে বলো, রঙীন টিভি তো আর নকল পাওয়া যাবে না। তাই কিনতে পারলাম না।'

আর একটা উপহারের কাহিনী বলি।

এক চৈত্রশেষের সর্বনাশা সন্ধ্যায় স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন. 'এবার পয়লা বৈশাখে তুমি আমাকে কি উপহার দিচ্ছো?' স্বামী গম্ভীরভাবে বললেন, 'কিছুই না।' স্ত্রী বললেন, 'তোমার মনে আছে গত বছর আমাকে কি উপহার দিয়েছিলে?' স্বামী আরো গম্ভীরভাবে বললেন, 'গত বছরও কিছুই না।' আহ্লাদি স্ত্রী স্বামীর চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, 'বলোতো, বছর বছর এইরকম একঘেয়ে উপহার ভালো লাগে।'

ইঁদুর

ঘরের মধ্যে টুকটুক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ইঁদুর, কয়েকটা মানে বেশ কয়েকটা। আমাদের সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছে, মোটেই ভয় পায় না। আমাদের খাওয়ার সময় টেবিলের চারপায়ের কাছে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ায়, যেন পোষা জীব, আমাদের খাবারে ওদের অংশ নির্ধারিত হয়েই আছে।

তা যদি হতো, যদি কুকুর-বিড়ালের মত আমাদের খাবারের ভাগ খেয়ে ইঁদুরেরা পরিতৃপ্ত থাকতো তা হলে ইঁদুর পোষা সত্যি সম্ভব ছিলো। কেউ কেউ হয়তো ভালই বাসতেন ইঁদুর পুষতে। সাদা ইঁদুর, গিনিপিগ বা খরগোশ, সে তো অনেকেই পোষেন। ইঁদুরের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা না থাকলে, তার দাঁতে তরবারি-লাঞ্ছিত ধার না থাকলে কত গৃহস্থই হয়তো শখ করে ইঁদুর পুষতেন। কি সুন্দর দেখতে, ঝলমল করছে চোখের মণি, গায়ের রং

বর্ষায় শেফালি পাতার মত ঘন কালো-সবুজ। হয়তো আদর করে এদের গলায় কেউ কেউ ছোট ছোট ঘুঙ্গুর বেঁধে দিতেন। এরা যখন তখন নৃত্য ভঙ্গিতে খাটের নিচে ছুটোছুটি করতো তখন ঘরের ভিতরে টুনটুন শব্দ উঠতো, জলতরঙ্গের মধুর আওয়াজের মতো।

নেংটি ইঁদুর, মেধো ইঁদুর, এমন কি ধেড়ে ইঁদুর সবই খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু হুলো বেড়ালের মত বিরাট, কুৎসিং-দর্শন ছুঁচো ইঁদুর তাদের কি কেউ পুষতো? নিশ্চয়ই পুষতো। লোকে কত কদাকার কুকুর পোষে, হায়েনা পোষে। অজগর সাপ দেখেছি কাঁচের বাকসে গৃহস্থের বাড়িতে, গলায় শিকলবাঁধা বনবেড়াল সেও যত্ন করে লোকে পোষে। তবে ছুঁচো পুষবে না কেন?

বিশেষ করে ছুঁচোর মত হিংস্র জন্তু পৃথিবীতে বিরল। কলকাতার এক-একটা পুরানো বাড়ির কলতলা, উঠোন পাসেজ চারদিক ঘিরে রাজত্ব করে ছুঁচো ইঁদুরেরা। তাদের দেখে কুকুর-বিড়াল ভয় পায়। তারা শিশুদের হাত থেকে রুটি কেড়ে নেয়, বাসন মাজবার সময় বৃদ্ধা দাসীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় হাতা বা চামচ এবং সঙ্গে সঙ্গে নর্দমায় নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সত্যিকথা বলতে কি ছুঁচোদের দুঃসাহসের কোনো তুলনা নেই। এই কলকাতা শহরে আজ পর্যন্ত যত লোককে কুকুর-বিড়ালে কামড়িয়েছে বলে শুনেছি তার চেয়ে অনেক বেশি লোককে শুনেছি ছুঁচো কামড়িয়েছে। একবার আমাদের কালীঘাটের পুরনো বাড়িতে রান্নাঘরে বাসন চুরি করতে গিয়ে এক চোর ছুঁচোদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রথমে সে পরিস্থিতির গুরুত্ব না বুঝতে পেরে একটি ছুঁচোশিশুকে লাথি মারে, তারপর তার সেই 'তাঁতির বাড়ি ব্যাংয়ের বাসা' ছড়ার বর্ণিত কাহিনীর নায়কের মত অবস্থা দাঁড়ায়। মুহূর্তের মধ্যে ড্রেন ও সুড়ঙ্গ নিবাসী এক দঙ্গল যুবক ও প্রবীণ ছুঁচো তাকে ঘিরে ধরে, প্রচণ্ড আক্রমণ করে, শরীর থেকে প্রায় আধ-কেজি মাংস খুবলিয়ে নেয়। চোরের আর্ত এবং পরিত্রাহি চীৎকারে আমরা সবাই জেগে উঠে রান্নাঘরে ছুটে যাই এবং তাকে উদ্ধার করি।

এ তো গেলো ছুঁচো ইঁদুরের সমবেত বীরত্বের কথা। কিন্তু কোনো

কোনো ছুঁচো একক বীরত্বেও অতুলনীয়। আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রমহিলা ধানবাদ থেকে দুদিনের জন্য বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। প্রথম দিন রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় অচেনা লোক বলেই হোক, বা গায়ে পা পড়ার জন্যেই হোক, একটি মধ্যবয়সী ছুঁচো তাঁর পা কামড়ে ধরে, পাকা আঠারো ঘণ্টা এই ছুঁচোটি অতিথি ভদ্রমহিলার পা কামিড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে, তাকে শিক দিয়ে খুঁচিয়ে সিগারেট দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে বা অন্য কোনো রোমহর্ষক উপায়েও তার নির্দিষ্ট কর্তব্য থেকে চ্যুত করা যায়নি।

ছুঁচোদের সম্পর্কে এতটুকু লেখার পর আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। এই প্রবল পরাক্রমশালী, দুঃসাহসী, পরিশ্রমী এবং স্বাস্থ্যবান জানোয়ারকুলের কে বা কারা ছুঁচো নামকরণ করেছিলেন? এদের চেহারার বা চরিত্রে, এদের আচার-আচরণে কোথাও সেই ছাপ নেই যাকে লোকে ছুঁচোত্ব বলে? এরা অনেক বেশি স্পষ্ট, সরল, হয়তো বা একটু বেশি সচেতন কিন্তু যাকে ছুঁচোপনা বলে এদের চরিত্রে সেটা কোথায়?

তবু ছুঁচোদের কথা থাক। বরং নেংটি ইঁদুরের কথা বলি, যাদের অত্যাচারে এখন আমি অতিষ্ঠ। কাল রাতে খুট খুট শব্দ শুনে জেগে উঠে আলো জ্বেলে দেখি, চারপাতা কথায় কথায় লিখে রেখেছিলাম তাই নিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড হচ্ছে টেবিলের উপরে। অন্তত দশটা (আরো গোটা তিনেক আলো জ্বালাতে পালিয়েছিলো) অকুতোভয় নেংটি ইঁদুর কাগজের টুকরোগুলো আরো আরো টুকরো টুকরো করলে। কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা অন্যত্র, সেখানে তাকের উপর আমার বহুসাধের বিয়ের ঘড়িটি আর প্রিয় পুরানো ফাউন্টেন পেনটি নিয়ে খেলা করছে কয়েকটি শিশু নেংটি, মানিব্যাগের উপরে ডিগবাজি দিচ্ছে দুজন এবং করুণতম অবস্থা আমার বহুমূল্য গন্ধতেলের শিশিটির, ঈশ্বর বোধহয় আমার এটুকু বিলাসিতা সহ্য করতে পারছেন না তাই এইসব সাপভ্রষ্ট দেবদূতদের প্রেরণ করেছে মহার্ঘ শিশিটি ধ্বংস করে ফেলার জন্যে।

আমি চারদিকের অবস্থা দেখে হায় হায় করে ছুটে গেলাম। কিন্তু কিসের ছোটাছুটি। এদিকে এক দলকে তাড়াই ওদিকে আরেক দল ফিরে আসে, এরা কলম নিয়ে দৌড় দেয়তো, ওরা লেখা নিয়ে ছোটে।

এবং আমিও ছুটছি। ছুঁচো ইঁদুরদের পালাকীর্তন লেখা বহুকষ্টে শেষ করে এখন নেংটি ইঁদুরদের পিছনে ছুটছি। কিংবা তারাই আমার পিছনে ছুটছে! আমাকে ছোটাচ্ছে। এখন আমার জুতোর মধ্যে নেংটি ইঁদুর, মোজার মধ্যে, আলনায়, বিছানায়। আমার স্ত্রীর পায়ের উপর দিয়ে তারা নির্ভয়ে চলে যায়, আমার কুকুরের পিঠে উঠে খেলা করে। একটা বারোয়ারি বিড়াল ছিলো সেও এদের অত্যাচারে আজ কয়দিন হলো নিরুদ্দেশ। আমি ভাবছি, সেটাই শেষ গতি কিনা?

হেরিডিটি

হেরিডিটি মানে সাদা বাংলায় যাকে বলে বংশের ধারা, এ-নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। চোরের ছেলেও কি চোর কিংবা ডাকাত হবে? উকিলের ছেলে উকিল না হোক ব্যারিস্টার হবে অন্ততঃ বাগ্মী হবে? ঘুঁটেগুড়ুনির ছেলে যদি জীবনে উন্নতি করে তাহলে কয়লার দোকানি কিংবা হিটারের কারখানার কর্তা হবে? প্রশ্নের ও গবেষণার শেষ নাই। কোথাও মেলে কোথাও হিসেব মেলে না। তর্কবাচস্পতির বোবা সন্তান কিংবা কবির ছেলে ফুটবলার এসব একটু খুঁজলেই চোখে পড়বে।

এই সম্পর্কে আরো কিছু বলার আগে আসল গল্পটা প্রথমেই জেনে নেওয়া ভালো। অল্পদিন আগে একটি প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্ন ছিলো, হেরিডিটি কাকে বলে। আমার এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন সেই পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক। তাঁর বাসায় গিয়েছি এক রবিবারের সকালে। কিছু গল্পগুজবের পর তিনি বললেন, 'একটা চমৎকার জিনিস দেখাচ্ছি।' একটি উত্তরপত্র খুলে তিনি দেখালেন একটি পরীক্ষার্থী লিখেছে হেরিডিটি অর্থাৎ বংশের ধারা কাকে বলে। পরীক্ষার্থী ছেলেটি

চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে বংশের ধারা মানে হলো! কারোর পিতামহ যদি নিঃসন্তান হয় তবে তার বাবাও নিঃসন্তান হবে।

দেখলাম পরীক্ষক বন্ধুটি এই প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দিয়েছে জিরো। যদিও এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা একান্তই অনুচিত, তবু আমি বললাম একে ফুলমার্কস দেয়া উচিত। চমৎকার বুঝিয়ে বলেছে ব্যাপারটা, এর মধ্যে ভুল হলো কোথায়? বন্ধুটি আপত্তি করলেন না তর্কও করলেন না কিন্তু নম্বর সেই জিরোই রেখে দিলেন। তা তিনি রাখুন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার অধিকার নেই। কিন্তু আমি আমার নিজের মত করে বংশের ধারা ব্যাপারটি একটু সোজা করে ব্যাখ্যা করতে চাই। যেমন আমি আমার ছোট বেলায় দেখেছি আমার বাবা আমার বন্ধুদের নাম কিছুতেই মনে রাখতে পারেন না, তাদের সাধারণত তাদের দাদার বা কাকার নামে ডাকেন কারণ বোধহয় ওদের চেয়ে ওদের দাদা-কাকাদের নাম তিনি আগে থেকে জানেন এবং পুরোটা এক অনিবার্য রাসায়নিক মিশ্রণে মনের মধ্যে ঘুলিয়ে ফেলেন। এ নিয়ে অকৈশোর বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে আসছি। কিন্তু অল্প কিছুদিন হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম আমার ছেলেও ঠিক একই অভিযোগে আমার উপর উত্তেজিত। আমি নাকি তার সখাসখীদের নাম একদম উল্টোপাল্টা করে বলি তারা এই নিয়ে হাসাহাসি করে এবং এই সামান্য কারণে আমার ছেলে বন্ধুদের মধ্যে মুখ দেখাতে পারছে না।

এ বিষয়ে আমার জ্যাঠামশায় একটি সমাধান বার করেছিলেন, তিনি সমস্ত অর্ধ-পরিচিত নাম-মনে-করা-কঠিন ভদ্রলোকদের কানাইবাবু নামে ডাকতেন, সমস্ত গৃহভৃত্যের নাম ছিল তাঁর কাছে রামদয়াল। এক আশ্চর্যের বিষয় ভদ্রমহোদয় এবং গৃহভৃত্যগণ যথাক্রমে সমভাবে এই আহ্বানে সাড়া দিতেন।

এই রকমভাবে আমিও চলবো কিনা কে জানে বংশের ধারা ব্যাপারটি আমার উপরে বেশ চেপে বসেছে। অন্যের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে আমি যে অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ নিজের মনে মুচকি হেসে উঠি যা চোখে পড়লে কাহিনীকার পাগলের মত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সেটা আমার একার

ব্যাপার নয়। আমার বাপ-ঠাকুর্দা চৌদ্দ পুরুষ হেসে আসছেন ঐ ভাবে শতাব্দী ধরে।

কিন্তু এসব তবু ভালো, অন্যের পক্ষে না হোক অন্ততঃ আমাদের পক্ষে কিছু খারাপ নয়, কিন্তু আমাদের বংশের ধারায় আরো দুটি ভারি গোলমেলে ব্যাপার রয়েছে। একটি হলো পাগলামি আরেকটি হলো সমস্ত শরীর বাঁদিকে হেলিয়ে চলাফেরা। আমাদের পাগলামি সম্পর্কে অহঙ্কার করা আমার নিজের পক্ষে উচিত হবে না লিখতে গেলে মহাভারত, আসলে এ-বিষয়ে লেখার কথা ভাবাটাই নিশ্চয় পাগলামি। সুতরাং দ্বিতীয় গোলমালটি অর্থাৎ ঐ বাঁদিকে ঝুঁকে থাকা ব্যাপারটা, কেউ কেউ সুরসিক যার জন্যে আমাদের লেফটিস্ট বা বামপন্থী বলেন, সেটা একটু বলি।

কোনোদিন কোনো রাস্তাঘাটে বারন্দায় যদি কোনো লোককে দেখেন, বাঁদিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাৎ হয়ে ছুটে যাচ্ছে না হেঁটে যাচ্ছে না তা হলে বুঝবেন সেই হলাম আমি কিংবা আমাদের বাড়ির কেউ।

এই নিয়ে আমার একটি অহঙ্কারি গল্প আছে। আমার এক উপরওয়ালা পার্থিব কৌতূহলবশত আমাকে একদা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, মশায় আপনার বাঁ পা কি ডান পায়ের চেয়ে ছোট? আমি বিনীতভাবে বলেছিলাম, 'হুজুর, আপনি উপরওয়ালা, আপনি যদি একথা বলেন সে বড় দুঃখের ব্যাপার হবে। আপনি হুজুর আমার বাঁ-পাটিই ছোট দেখলেন আমার ডান পাটি যে বড় সেটা দেখলেন না।

কুকুর সংবাদ

কয়েক বছর আগে এক প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিকে এক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের একটি চিঠি দেখেছিলাম। ভদ্রলোক অতি কষ্টে এবং বহু চেষ্টায়, বেশ পরিমাণ টাকা সেলামি দিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় পণ্ডিতিয়ায় একটি ফ্ল্যাট সংগ্রহ করেছিলেন। বসবাসও শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ

পর্যন্ত থাকতে পারলেন না। বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্যে হলেন। এই নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে তাঁর বিশ্রামের শান্তি, রাতের ঘুম সমস্ত কিছু দূর হয়ে গিয়েছিলো।

এর জন্য অবশ্য সংঘাতিক বাড়িওলা, দুর্দান্ত প্রতিবেশী বা পাড়ার মাস্তান কাউকেই তিনি দায়ী করেননি। তাঁর এই পাড়া ছাড়ার প্রধান কারণ হয়েছিলো একদঙ্গল কুকুর। অসংখ্য কুকুর তাদের চীৎকার, মারামারি, পরস্পর খেলাধূলা ও আলোচনাকালে গর্জন এবং কখনো-সখনো পথচারীদের তাড়া করে যাওয়া—এই সব নৈমিত্তিক কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁকে শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেয়নি।

সেই সময় এই চিঠি 'সম্পাদক সমীপেষু' স্তম্ভে পাঠ করে আমি হেসেছিলাম, মনে হয়েছিলো একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। রাস্তায় কুকুরের অত্যাচারে বাসায় থাকতে পারবো না এ কেমন কথা ? একটু-আধটু বিরক্ত লাগতে পারে, কিন্তু তার জন্য সেলামি দিয়ে ভাড়া করা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হবে, এ একেবারে অবিশ্বাস্য।

তখন হেসেছিলাম, কিন্তু এখন আর হাসি না। কারণ এখন আমি নিজেই এ পাড়ায় থাকি।

এ পাড়ার যাঁরা প্রাচীন বাসিন্দা তাঁদের কারো কিন্তু এই কুকুরগুলো নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তাঁদের পুরো ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। লোডসেডিং-এর সময় অন্ধকার রাস্তায় সন্ধ্যাবেলা ক্লান্তদেহে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় দশ-বারোটা কুকুরের তারা দৌড়ে অন্যের অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া, মাসে দু-মাসে একবার গোড়ালিতে, হাঁটুতে বা কোমরে কুকুরের কামড় খাওয়া, সারারাত ধরে জানলার নিচে কুকুরশিশুদের আর্ত ক্রন্দন এবং তাদের মা-মাসী বাবা-কাকাদের আত্মকলহ, এ-নিয়ে এ পাড়ার আদি অধিবাসীদের কোনো অভিযোগ নেই। রেল ইঞ্জিনের প্রবল ঘটাং-ঘটাং হুশ-হুশ ইত্যাদির মধ্যে ড্রাইভার-ফায়ার-ম্যানরা যে রকম সাবলীলভাবে গল্প-গুজব করেন কিংবা সুখে ঘুমোন, তেমনিই এ পাড়ার পুরানো লোকদেরও এইসব গোলমাল অভ্যাস হয়ে গেছে। এই কুকুরমণ্ডলীর বিরক্তি তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না।

মুসকিল হয়েছে আমার। এবং আমার মত যাঁরা মূলত এ পাড়ার বাইরের লোক, বাড়ি ভাড়া করে এখানে বসবাস করতে এসেছেন. তাঁদের। আমাদের ভীষণ কষ্টে পড়তে হয়েছে।

আমি প্রথমে এসেই লক্ষ্য করেছিলাম, এই কুকুরগুলো আমার যারা বাইরের লোক এ পাড়ায় এসেছি, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে মনে করে। এই কুকুরদের তর্জন-গর্জন, লম্ফ-ঝম্প ইত্যাদির অনেক-খানিক আমাদের মত নবাগতদের প্রতি।

তাই আমি এ পাড়ায় এসেই প্রথাসিদ্ধ নানাবিধ উপায়ে এই কুকুরদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করেছি। এই উপায়গুলির প্রধান দুটি হলো বিস্কুট-পাউরুটি-বাসিরুটি উচ্ছিষ্ট-উদ্বৃত্ত ইত্যাদি খাওয়ানো এবং মধ্যে মধ্যে সময়ে-অসময়ে দুই ওষ্ঠ কুঞ্চিক করে সেই ফাঁকের মধ্যে জিহ্বাগ্র দিয়ে 'চুচু-চুচু' করা। নিয়মিত অভ্যাসে সিটি দেওয়ার মনই এই 'চুচু' ধ্বনি-নিক্ষেপ বহুদূর পর্যন্ত তরঙ্গায়িত করা যায়। এবং মধ্যে মধ্যেই কিছুটা তাগিদে এবং কিছুটা নতুন অভ্যাসবশত আমি আজকাল তীব্র 'চু-চু' ধ্বনি করে উঠি। আমার এই 'চু-চু' ধ্বনি শুনে অনেক লোক গলির মোড় থেকেই বুঝতে পারেন আমি বাড়িতে আছি কিনা?

শুধু চু-চু বা তু-তু করে নয়, জানলার পাশে চেয়ার নিয়ে বসে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেছি এই কুকুরদের নিয়ে এবং আজ অনায়াসে আড়াইশ পৃষ্ঠার একটা গবেষণাগ্রন্থ লিখে ফেলতে পারি যার নাম হতে পারে, পণ্ডিতিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের পথবাসী কুকুরসমাজের রীতি ও নীতি।'

দশটা কুকুর চমৎকার অলসভাবে ফুটপাথে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে আছে এ ওর কোলে মাথা গুঁজে, রাস্তা দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া, মানুষজন যাচ্ছে কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই. তাকিয়েও দেখছে না। বেশ চলছে সব। হঠাৎ কি হয়ে যায়, একটা কুকুর অসংখ্য গাড়ির মধ্যে কেন যে একটার দিকে পাগলের মত ছুটে যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, তার পিছে পিছে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় তার সঙ্গীসাথীরা।

এত লোক যায় কাউকে কিছু বলে না, হঠাৎ একেকটা লোককে দেখে

তেড়ে যায় দশটা কুকুর দল বেঁধে কিন্তু সেই লোকটাকে হয়তো এতদিন কিছুই বলেনি, প্রতিদিনই দেখছে। হঠাৎ আজকেই তেড়ে গেলো কেন?

এ বিষয়ে কেউ কখনো ভাবেন নি, তলিয়ে দেখেন নি, ভালো করে গবেষণা বা তদন্তও হয়নি। তাই কেউ কিছু বুঝতে বা ধরতে পারেন না। কিন্তু আমি গভীর অধ্যবসায় সহকারে লক্ষ্য করে কিছু কিছু বুঝতে পেয়েছি। একটি মাত্র উদাহরণ আজ দিচ্ছি।

যেমন কুকুরেরা পালিশ করা জুতো একদম পছন্দ করে না। ধবধবে কাচা ধুতি-পাঞ্জাবিও ভীষণ অপছন্দ। চকচকে জুতোর সঙ্গে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় এদের দু' চোখের বিষ। এই রকম পোষাকে কেউ আমাদের পাড়ায় এলে শতকরা নব্বুই ভাগ সম্ভাবনা কুকুরের তাড়া খাওয়ার। আবার খুব ময়লা বা ছেঁড়া জামা-কাপড় বা কাঁধে ঝোলা (পুরনো কাগজওয়ালা) ইত্যাদিও এরা প্রবল সন্দেহের চোখে দেখে। রাস্তায় ঝগড়া বা কথা-কাটাকাটি করলেও এরা খেপে যায়, প্রথমে চুপচাপ দুই বিবদমান দলের মুখ-চোখ নিরীক্ষণ করে তারপর হঠাৎই এদের মধ্যে সবচেয়ে বুড়ো, লোমওঠা একটা কুকুর বিনাবাক্যব্যয়ে যাকে সবচেয়ে দোষী বলে মনে করবে তাকে খ্যাঁক করে কামড়িয়ে দেয়। অবশ্য এই কুকুরটা কামড়ানোই মঙ্গল, কারণ এর দাঁত নেই।

এর পরের অধ্যায় কিন্তু বড় গোলমেলে। দাঁতহীন কুকুর মাড়ি দিয়ে কামড়িয়ে রক্ত বার করে দিলে তাতে জলাতঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং সেই ভয়ে তলপেটে একুশটা চার ইঞ্চি ইঞ্জেকশান নেওয়া প্রয়োজন কিনা—এ নিয়ে শুনেছি গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সেই গবেষণা আমার জন্যে নয়, সেটা ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরাই করছেন।

মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

একটি বহুপ্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকে মিষ্টান্নের সঙ্গে ইতরজনের কি একটা সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকটির মানে আমি ঠিক জানি না. তবে অন্য দশজনের মত আশৈশব এটি আমি শুনে আসছি নিজেও বহুবার বলেছি এবং দু' চারবার গল্প প্রবন্ধে ব্যবহার করি নি তাও বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো না।

শ্লোকটির অর্থ সম্ভবত বাজে লোকেরা মিষ্টি খাবে কিম্বা বাজে লোকদের মিষ্টি খাওয়াও। এইখানেই ব্যাপারটা আরো গোলমেলে হয়ে পড়েছে। বাজে লোকেরা মিষ্টি খাবে বা তাদের খাওয়াতে হবে কেন?

বাজে লোকেরা গাঁজা খায় ভাং খায় তেলেভাজা খায় ব্যাঙের মাংস খায় সরষে বাটা সজনের ডাঁটার চচ্চড়ি খায় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যায় চিনে হোটেলে গিয়ে টিকটিকির লেজের লঙ্কা ঝোল খায় কিন্তু মিষ্টি কখনোই খেতে চায় না। মিষ্টি খায় ভদ্রলোকে, ভালো লোকে। বাজে লোকদের মিষ্টি খেতে অনুরোধ করলে তারা ভয়ঙ্কর আপত্তি জানায়। একবার এক ভদ্রমহিলাকে দুটো সন্দেশ খেতে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি এমন চমকে উঠেছিলেন যে আমারই সন্দেহ হয়েছিলো কোনো কুপ্রস্তাব করলাম নাকি?

সবাই জানেন স্যার আশুতোষ মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মিষ্টান্ন-প্রীতিসম্পর্কে বিখ্যাত সব গল্প এখন প্রায় উপকথায় পরিণত হয়েছে। স্যার আশুতোষ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তখন নাকি একবার ভেবেছিলেন মিষ্টান্ন চর্চার একটি বিভাগ করবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পর্যন্ত পড়ানো হবে। মহামধুর শ্রীযুক্ত ভীম নাগ হবেন প্রধান অধ্যাপক আর রসশাস্ত্রী শ্রীকে সি দাস রিডার। সবই নাকি প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিলো শুধু মিষ্টান্ন শিল্প হিসেব পাঠ্য বিষয়টিতে বি-এ এম-এ ইত্যাদি

আর্টস-এর ডিগ্রি দেওয়া হবে কিম্বা মিষ্টান্ন বিজ্ঞান হিসাবে সায়েন্স কলেজে পড়ানো হবে বি এস সি এম এস সি ডিগ্রি দেওয়া হবে এটুকু সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়ে একটু ঠেকে গিয়েছিলো এবং দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত তা কার্যকরী করা হয় নি।

কার্যকরী হবে কি হতো বলা কঠিন। ঘরে ঘরে রসগোল্লার অনার্স গ্রাজুয়েট কিন্তু মহতী সভায় পানতুয়ার ডকটরেট হয়তো আমরা দেখতে পেতাম। তা না পাই এমন কি মিষ্টান্ন কলায় পারদর্শিনী পুত্রবধূ লোকে খুঁজতো অথবা মিষ্টান্ন বিজ্ঞানে কৃতী জামাতা, তা নিয়েও এখন আমরা আলোচনার মধ্যে যাবো না ; আমাদের চিন্তা অন্যত্র।

পৃথিবীতে বাজে লোকের সংখ্যা যেমন ভালো লোকের তুলনায় ঢের কম, তেমনিই মিষ্টান্ন লোভীর সংখ্যা মিষ্টান্ন বিরাগীর তুলনায় অনেক বেশি। সবচেয়ে দুঃখের কথা অধিকাংশ মিষ্টি পেটুকের অবস্থা অতি অস্বচ্ছল। তার একটা কারণ অবশ্য ঐ মিষ্টির প্রতি লোভ। মদ নয় মহিলা নয় বাড়ি নয় গাড়ি নয় শুধু মিষ্টি খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে এমন একাধিক লোককে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। সবচেয়ে বড় কথা এই যে মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপারটা আবার একক অনুষ্ঠান হলে জমতে চায় না। পিসতুত ভাইয়ের শালা মেজ মাসিমার খুড়তুতো ভাই প্রতিবেশী সহপাঠী সহকর্মী এই রকম বেশ জন কয়েক সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সহ সমবেত মিষ্টান্ন ভোজন অনুষ্ঠান খুব জমজমাট হয়।

এই জমজমাট করতে করতেই অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে যান। কিন্তু লোভ তখনো জিভের ডগা ছুঁয়ে থাকে। তখন ফিকির খুঁজতে হয়। শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষার রাতে কেউ মধ্যমগ্রাম থেকে গড়িয়া আসেন বিবাহে নিমন্ত্রণে মিষ্টান্নের গন্ধে। তাঁকে দেখে সবাই খুসি হয়ে প্রশংসা করে সেজো মেসোমশায়ের মত সামাজিকতাবোধ, কর্তব্য জ্ঞান একালে দেখাই যায় না। কিন্তু যদি পারেন এই বৃদ্ধ কর্তব্যবাদী সেজ মেসোমশায়কে হিপ্নোটাইজ করে আচ্ছন্ন করে কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করুন, কেন এই দুর্যোগে এত দূরে এসেছেন ?' দেখবেন, বৃদ্ধ মহোদয় কি বলেন' তিনি জড়িত কণ্ঠে অবশ্যই উত্তর দেবেন, মিষ্টি খেতে।'

সত্যিই, এই দুর্দিনের বাজারে মিষ্টি খাওয়ার আর কি উপায়ই বা হতে পারে ? চল্লিশ বছর আগের সেই সোনালি সুদিন যখন এক টাকায় একশোটি সন্দেশ বা চৌষট্টিটি রসগোল্লা পাওয়া যেতো সেই তখনকার একটি কাহিনী মনে পড়ছে।

কাহিনীটি আমার নয়, কিংবা কারো কাছে সেই অর্থে শোনাও নয়। বাংলা সিনেমার আদ্যিকালের এক হাসির বইয়ে এই ঘটনাটি ছিলো, আমি নিজে দেখেছি কিনা মনে পড়ছে না তবে ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে এই গল্পটা বহুবার আলোচনা হয়েছে, মনের মধ্যে ছায়াছবির মত গেঁথে আছে।

গল্পটা কেউ কেউ হয়তো জানেন, তবু বলি। দুই জোচ্চোর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এক সন্দেশের দোকানে গিয়েছে। প্রথমজন আগে গিয়েছে, গিয়ে দোকানের বাইরে টুলে বসে সন্দেশ খাচ্ছে, খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় জোচ্চোর এলো, সে এসে ভিতরে বসে খুব তাড়াতাড়ি অনেক মিষ্টি খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল দাম না দিয়েই। দোকানদার তাকে আটকিয়ে দিলো, 'কি মশায়, দাম দিয়ে যান।' দ্বিতীয় জোচ্চোর বললো, 'সে কি ? এই মাত্র দিলাম তো আপনাকে ?' মুহূর্তের মধ্যে দোকানদার এবং দ্বিতীয়জনের মধ্যে তুলকালাম ঝগড়া বেধে গেলো, পরস্পর পরস্পরকে মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর বলে চিৎকার, চেঁচামেচি। বহু লোক ছুটে এলো। তখন প্রথম জোচ্চোর টুলে বসে আছে, তার সন্দেশ খাওয়া শেষ। সবাই ছুটে আসতে দোকানদার ও দ্বিতীয় জোচ্চোর তাদের অভিযোগ জানালো। সব শুনে লোকেরা বললো, 'এই ভদ্রলোক তো প্রথম থেকে দেখেছেন সব ঘটনা, ইনিই বলুন।' কিন্তু প্রথম ভদ্রলোক তখন আর কি বলবেন, দেখা গেলো তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে অঝোরে, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। সবাই অবাক হয়ে গেলেন, 'কি ব্যাপার, কি হোলো ?' প্রথম ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এই ভদ্রলোক আমার সামনে দাম দিলেন, তাই দোকানদার অস্বীকার করছে, আর আমি যখন দাম দিই তখন তো কেউই ছিল না, আমার কি হবে ?'

ছাগল

বড় বড় লেখকেরা যাঁরা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তাঁরা তাঁদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে কত রকম চিঠি পান। প্রতিদিন তাঁদের সিন্দুক প্রমাণ ডাক-বাক্স ভরে যায় নীল গোলপী সাদা ভারি-ভারি খামে। তাঁদের অনুরাগী-অনুরাগিণীরা কত কথা লেখে, কত অনুরোধ, বই-ফটো-চকোলেট-ফুল কত কি উপহার আসে।

সব শুনি সব জানতে পারি। কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। আমার কোনো পাঠক নেই, আমার পাঠিকারা এখনও জন্মায় নি। তাদের মা-বাবারা এখন নার্সারিতে পড়ে। আর দুই একজন যদি কোথাও কখনো থেকেও থাকে তারা থাকে ডাকঘর বর্জিত দেশে সে সবজায়গায় খাম পোস্টকার্ড কিছু পাওয়া যায় না; কোনোদিন কেউ লেখে না তারাপদবাবু আপনার লেখা পড়ে কি হলো জানেন, কাল রাতে…'

এই শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে হঠাৎ সেদিন একটা চিঠি পেলাম আমার জীবনের প্রথম ও একমাত্র পাঠকপ্রেরিত চিঠি। চিঠিটি অবশ্য একটু রহস্যময় এবং পত্র লেখক সত্যি আমার অনুরাগী কিনা বোঝা কঠিন চিঠিটির বয়ান এই রকম—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি কুকুর বিড়াল চোর-জোচ্চোর অনেক কিছু লইয়া অনেক কিছু রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্যই আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু একটা কথা মনে আসিতেছে যদি অভয় প্রদান করেন তো বলি। আপনি কখনো ছাগল লইয়া কিছু লেখেন না। গরু লইয়া ভেড়া লইয়া পর্যন্ত কতবিধ উল্টো-পাল্টা রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু

ছাগলের প্রতি আপনার এই বিরাগ কেন ? হতভাগ্য ছাগল সমাজের করুণ ব্যা-ব্যা ধ্বনি আপনার কর্ণকুহরে কি কিছুতেই প্রবেশ করিবে না ;

ইতি—

বিনীত জগদম্বাপ্রসাদ দাস

পুঃ নাকি আত্মজীবনী রচনায় আপনার স্বভাবগত অনীহাই আপনাকে ছাগল বিষয়ে আলোচনা হইতে বিরত রাখিয়াছে ;

সম্ভবত ঐ জগদম্বাপ্রসাদ দাস নামটি ভুয়ো অর্থাৎ ছদ্মনাম। এমনও হতে পারে কোনো সম্পাদকীয় দপ্তর থেকেই এই চিঠিটি আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি কি জাতের সেটা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে এবং ঐ শেষ লাইন পুনশ্চ অবশ্যই মানহানিজনক।

কিন্তু আমি অনুপায়। চিঠিতে জগদম্বাপ্রসাদের কোনো ঠিকানা নেই। হাতের লেখা হয়তো একটু চেনা-চেনা কিন্তু তার উপরে কাল্পনিক আস্থা করে কোনো ক্ষমতাশালী লোকের সঙ্গে কলহে নামা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বরং যে গুরুদায়িত্ব ঐ জগদম্বাপ্রসাদ নামীয় অথবা ছদ্মনামীয় মহাত্মা আমার এই সামান্য স্কন্ধে অর্পণ করেছেন আমি সেটাই যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করি।

কিন্তু সত্যিই আমার ছাগল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই। সেই কবে দাঁড়াতে শেখার বয়েসে পিতামহী আমাকে কিছুদিন শক্ত সমর্থ করে তৈরি করার জন্যে নিয়ম করে ছাগলের দুধ খাইয়েছিলেন। এছাড়া ছাগল সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অতি সামান্য। তাছাড়া সেই ছাগদুগ্ধ পানের মধুর স্মৃতিও আমার এ বয়েসে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। সবচেয়ে বড় কথা ঐ মধুর স্মৃতিও আমার এ বয়েসে আর বিশেষ করে যতবারই পুনশ্চের পংক্তিটি পড়ছি আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হচ্ছে রচনাটা ঠিক সোজাসুজি ছাগল বিষয়ে হলে জগদম্বাপ্রসাদের পছন্দসই হবে না এতে আমার মতো ছাগল সদৃশ মনুষ্যদের সম্পর্কে কটাক্ষ থাকা চাই।

সবাই জানেন কোনো বিদ্যায়ই এমন কি কটাক্ষপাত বিদ্যায় পর্যন্ত আমার কোনো পারদর্শিতা নেই। বাধ্য হয়ে অভিধানের শরণাপন্ন হলাম। প্রথমেই একটা গ্রাম্য অভিধানে পেলাম ছাগল মানে ছাগ। চমৎকার

ব্যাপারটা। বেশ পরিষ্কার বোঝা গেলো, অবশ্য এর পরে কমা দিয়ে লেখা আছে অজ পাঁঠা। পাঠ করে আরো চমৎকৃত হলাম ছাগল মানে পাঁঠা এটা সবসময়েই জানতাম কিন্তু অভিধানে পাবো এটা আশা করিনি। তার চেয়েও বড় কথা বহু অভিধানেই একটা স্পষ্ট করে বলা আছে যে ছাগল পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ হবে ছাগলী। এর পরে আমি একটু শান্ত হয়ে ভাবতে বসলাম. ভেবে দেখলাম আমরা যখন বলি ছাগলের দুধ খাচ্ছি তখন প্রকৃতই ভুল বলি। এবং রামছাগল বলতে যে দুগ্ধদায়িনী ঘণ্টালম্বিত বিরাট দাড়ি-ওয়ালা জীবটির ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে অভিধানিক অর্থে সেটা একেবারেই উচিত নয়। কারণ রামছাগল হলো এক জাতের বড় ধরণের পাঁঠা।

এর পরে আরএকটু নিচে চোখ নামাতেই চোখ পড়ে ছাগলাদ্য শব্দটির উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়ে উঠি। বহুকাল ধরে এই শব্দটির সঙ্গে অনেকের মতই আমি পরিচিত। জিনিসটি কি স্পষ্ট জানি না কিন্তু আয়ুর্বেদীয় ওষুধের বিজ্ঞাপন এবং কবিরাজি দোকানের সাইন বোর্ডে ছাগলাদ্যঘৃত শব্দটি সহস্রবার দেখেছি। আজ জানলাম এর সঙ্গে আমাদের চেনা ছাগলের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ পাঁঠারও খুব সম্পর্ক নেই। ছাগলাদ্য ঘৃত মানে হলো খাসির চর্বি দিয়ে তৈরি একরকম ওষুধ এবং এটা কোনো মতেই ছাগলের দুধের ঘি নয়।

এই পর্যন্ত লেখার পরে হঠাৎ একটা পুরনো গ্রাম্য কথা আমার মনে পড়লো। ছাগলের বাচ্চা হয় তিনটে তার দুটো দুধ খায় আর একটা লাফিয়ে বড় হয়। তিনটে কেন চারটে-পাঁচটা বাচ্চাও ছাগলের, কিন্তু ছাগলের মায়ের দুধ মাত্র দুটো। প্রকৃতিতে এরকমটি আর কোথায়ও নেই। গরুর একটা বাচ্চা হয় দুধ চারটে, কুকুর বিড়ালের বাচ্চা ছয়-সাতটা পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু তাদের মায়ের দুধের সংখ্যা আট। বাঘ, সিংহ, মানুষ, বানর সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে যে নিয়ম চলছে সে নিয়ম ছাগলের বেলায় নেই আশ্চর্য।

আরো আশ্চর্য কোনো অভিধানেই ছাগলে কি না বলে পাগলে কি না খায় এই প্রবাদ বাক্যটি খুঁজে পেলাম না এমনকি প্রবাদের অভিধানেও না।

জ্ঞানের প্রদীপ

সরলচিত্ত পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, আপনারা হয়তো কেউ জ্ঞানের প্রদীপ নামক দ্রব্যটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন। এতে দোষের কিছু নেই, আমিও জানতাম না জিনিসটা কি। আমাদের ছোটবেলায় এরকম কোনো জিনিস ছিলো না, আর থাকলেও আমাদের সেই দূর মফঃস্বল শহরে 'জ্ঞানের প্রদীপ' পৌঁছয় নি।

আমার কনিষ্ঠ শ্যালক শ্রীমান ভজগোপাল তার ভাগিনেয় অর্থাৎ আমার ছেলেকে একটি 'জ্ঞানের প্রদীপ' কিনে দিয়েছে। জ্ঞানের প্রদীপ হলো একটি ঐ জাতীয় আধুনিক খেলনা যাতে শিক্ষা ও খেলা একই সঙ্গে হয়ে থাকে। আরো ভালোভাবে বলা উচিত, এর মাধ্যমে খেলাচ্ছলে শিক্ষা লাভ হয়। এই শিক্ষালাভ শুধু শিশুরাই করে থাকে তা নয়, যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, অনেক সময় যথেষ্ট প্রাপ্ত বয়স্কেরাও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

আমার কনিষ্ঠ শ্যালক কি ভেবে তার ভাগিনেয়কে এই রকম একটি জিনিস উপহার দিলো তা আমার পক্ষে বলা কঠিন। কিন্তু এর জন্যে আমাকে যা শিক্ষা পেতে হয়েছে তা পূর্বাহ্নে জানা থাকলে তায় দিদির কথা চিন্তা করে সে নিশ্চয় এরকম একটা প্রাণঘাতী খেলনা উপহার দিতো না।

'জ্ঞানের প্রদীপ' আসলে একটি সুদীর্ঘ প্রশ্নমালা, যার প্রতিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অসংখ্য উত্তর। একটি চৌকো কাঠের বাক্সে এই প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পর্যায়ক্রমে সাজানো রয়েছে, সেই কাঠের বাক্সের প্রান্ত থেকে লাল ও নীল এই দুই রঙের দুটি তার বেরিয়ে রয়েছে, আর তার অপর প্রান্তে রয়েছে একটি লম্বা তার ও প্লাগ। প্লাগটি ইলেকট্রিক সুইচে লাগিয়ে খেলাটি শুরু করতে হবে। বহুবিধ প্রশ্ন এবং বহুতর উত্তরের মধ্য থেকে সঠিক প্রশ্নের গায়ে লাল তার এবং সঠিক উত্তরের গায়ে নীল তার লাগাতে পারলে বাক্সটির কেন্দ্রস্থলে একটি ইলেকট্রিক বাল্ব আছে সেটা জ্বলে উঠবে।

জ্ঞানের প্রদীপের প্রশ্নগুলি এইরকম :

(ক) ক্যাঙারুর বাচ্চা জন্মানো মাত্রই লাফ দেয় কি ?

(খ) সিংহের বাচ্চা জন্মাবার সময় চোখ ফোটা থাকে কি ?

(গ) কুমীরের ডিম হয় কি ?

বুদ্ধিমান পাঠক (এবং পাঠিকা) অনায়াসেই অনুমান করতে পারবেন যে এই প্রশ্নগুলি প্রায় সমার্থক কিন্তু তার কারণ এই যে, পশু-শিশু নামক একটি মাত্র সিরিজ থেকে আমি প্রথম তিনটি প্রশ্ন তুলে দিয়েছি।

'পশু-শিশু' প্রশ্নমালার উত্তরে এবার আসা যাক। প্রথমেই (গ) প্রশ্নের উত্তরে আমি আকর্ষণ বোধ করেছিলাম। কোথায় যেন একবার পড়েছিলাম (নাকি শুনেছিলাম), এই নগরে হোটেল-রেস্তোঁরায় যে মাংস এবং ডিম ব্যবহার করা হয় তা যথাক্রমে মোষের এবং কুমীরের। আমার এই ধারণা সম্পর্কে আমি এত বদ্ধমূল ছিলাম যে কুমীরের ডিম হয় কি প্রশ্নে আমি নিঃসন্দেহে হ্যাঁ সূচক উত্তরের গায়ে নীল তার এবং প্রশ্নের গায়ে লাল তার লাগিয়ে দিলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তর শুধু হয়েছিলো কিনা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, সেই মুহূর্তে সমস্ত অঞ্চলের আলো ঝুপ করে নিভে গেলো।

চল্লিশ পয়সা দামের চারটি মোমবাতি আপাদমস্তক নিঃশেষিত হওয়ার পর যখন গভীর রাতে আলো আবার ফিরে এলো, আমার ছেলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে ; আর আমারও সাহস হলো না পুনর্বার পরীক্ষা করে জানার যে, কুমীরের ডিম সত্যি হয় কিনা। জানতে পারলে হিসেব করতে পারতাম কত সহস্র কুমীর সন্তান ওমলেট, ডেভিল, মোগলাই পরোটা ইত্যাদি মারফৎ হোটেল, রেস্তোঁরাগুলির কল্যাণে আমার পেটের মধ্যে কিলবিল করছে।

সে যা হোক, পরদিন সকালে আমার ছেলে ঘুম থেকে উঠেই বায়না ধরলো, 'জ্ঞানের প্রদীপ'। সম্ভবত সে তার বাবার বিদ্যের দৌড় যাচাই করে দেখতে চায়। তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। সুতরাং এবার (ক) প্রশ্ন শুরু করলাম, ক্যাঙারুর বাচ্চা জন্মানো মাত্রই লাফ দেয় কি ?

এই প্রশ্নটি দেখে যত সোজা মনে হয় উত্তর কিন্তু খুবই জটিল। (ক) প্রশ্নের প্রথমত দুটি উত্তর (১) না এবং (২) হ্যাঁ। আমি সাহস অবলম্বন করে হ্যাঁ উত্তরে তার লাগালাম এবং সেই বিদ্যুতের বাল্বটি জ্বলে উঠলো, সুন্দর আলো দেয় বাল্বটি! কিন্তু সমস্যার এখানেই সমাধান হলো না, এইবার সূক্ষ্মতর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো। যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর (২) হয় তবে জন্মানো মাত্র ক্যাঙারুর বাচ্চা কতটা লাফ দেয়? আবার (ক) থেকে শুরু; (ক) ছয় ইঞ্চি, (খ) এক ইঞ্চি, (গ) আধ মাইল, (ঘ) সাড়ে তিন ফুট, (ঙ) পাঁচ গজ—এইভাবে এত পর্যন্ত।

এইসব দেখে আমার মাথা কেমন যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিলো, নাকি ইলেকট্রিকের দোষ, আমি যেই (গ) উত্তরে অর্থাৎ ক্যাঙারুর বাচ্চা জন্মানো মাত্র আধ মাইল লাফ দেয় এইখানে তার লাগিয়েছি, কোথায় কি যে হলো. মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গোঁ গোঁ করতে করতে পড়ে গেলাম মেঝেতে।

বারো ঘণ্টা পরে সন্ধ্যাবেলা জ্ঞান হতেই দেখি, মাথার কাছে টেবিলে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। এ জিনিস আমাদের বাড়িতে কখনো ছিলো না। স্ত্রীর দিকে চোখ মেলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন, ওটা সেই জ্ঞানের প্রদীপ। আবার অজ্ঞান হতে যাচ্ছিলাম। স্ত্রী জানালেন আর ভয় নেই, সামান্য বুদ্ধি খরচ করে তিনি জ্ঞানের প্রদীপকে টেবিল প্রদীপ করেছেন, সত্যিকারের নতুন ডিজাইনের ল্যাম্প হয়েছে।

ক্রস্ কানেকশন

বর্ষার শেষে যখন দুর্বাঘাস খুব সতেজ হয়ে ওঠে তখন এই ঘাসগুলো গোড়া সমেত তুলে আনতে হবে। তারপর জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে কাদামাটি ছাড়িয়ে নিতে হবে, নিয়ে ঘাসের বীচিগুলি আলাদা করে ফেলতে হবে। এইরকমভাবে এক ছটাক ঘাসের বীচি সংগ্রহ হয়ে গেলে, সেটা

ভালো করে খটখটে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিতে হবে, ভাদ্রমাসের রোদ্দুর হলেই খুব ভালো। সেই শুকনো বীচি ভালো করে কর্পূর দিয়ে মাখিয়ে গরম জলে কাঁচা হলুদের সঙ্গে এক ঘণ্টা টগবগিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে, যখন জল সম্পুর্ণ মরে যাবে তখন কাঁচা হলুদ ও দুর্বাঘাসের বীচির এই মিশ্রণ তিন দিন পরে শিল-নোড়ার মন্থন করে কাদা-কাদা করে প্রলেপ বানাতে হবে। এই প্রলেপ কৃষ্ণা একাদশীর সন্ধ্যায় মাথা নেড়া করে মাখাতে হবে, পাগলামি বা উন্মাদ-রোগের প্রথম স্টেজে অব্যর্থ ওষুধ এই ঘাস-হলুদের ক্বাথ্।'

এই টোটকা ওষুধটি বলা যেতে পারে প্রায় স্বপ্নাদ্য। আমি ঠিক স্বপ্নে পাইনি, এ ধরনের স্বপ্ন দেখার আমার অভ্যাস নেই কিন্তু আমি টেলিফোনে ক্রশ-কানেশনে এই টোটকার বিবরণটি পেয়েছিলাম। আলোচ্য বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পেরে (আমার ফোনে আলাপচারী দুই অনু-প্রবেশকারী এদের কিছু বুঝতে না দিয়ে এবং বাধা না দিয়ে) আমি সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল দিয়ে কাগজে টুকে নিই।

এই রকম আরো বহু জিনিস এবং জিনিসের সন্ধান আমি টেলিফোনে ক্রশ-কানেকশন মারফৎ পেয়েছি। এই ক্রশ-কানেকশনের দয়াতেই আমি জানতে পারি যে চীনে রেঁস্তরার রাঁধুনিরা কেউই চীনে নয়, কলকাতায় সবচেয়ে সস্তা কাঁঠাল পাওয়া যায় খিদিরপুর বাজারে এবং কালীঘাট পার্কের পিছনে এক বাড়িতে এক অন্ধ বৃদ্ধের কাছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচের দুটি টিকিট কোনো অজ্ঞাত কারণে রয়েছে।

স্বীকার করা উচিত, আমি প্রত্যেকবারই এইসব ফোনলব্ধ জ্ঞান যথাসাধ্য নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। এবং দু-একবার উপকৃতও হয়েছি।

ফলে অন্যান্যেরা টেলিফোনে ক্রশ-কানেকশন হয়ে গেলে যতটা উত্তেজিত হয়ে যান, আমি তা হই না। আমি যথাসাধ্য ধৈর্য ধরে, ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করি।

অবশ্য এই ব্যাপারে আরো একটা বড় কারণ আছে। ক্রস্-ক্যানেকশনে অপর ব্যক্তিদ্বয়ের কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র সবাই যেমন পাগলা বেড়ালের মত

ফুঁসে ওঠেন, আমি যে তা উঠি না, তার মানে এই নয় যে, আমি অন্যান্যদের চেয়ে ধৈর্যশীল বা বেশি সহনশীল। আসলে আমার অসুবিধে হলো আমার নিজের বীভৎস গলা। এর আগে বহুবার বলেছি এবং প্রায় সকলেই জানেন যে আমার গলার স্বর যে একবার শুনেছে সে কখনোই ভোলে না, ভোলা সম্ভব নয়। ফলে এই সঙ্কীর্ণ মহানগরে আমার পক্ষে গলাবাজি করা ভীষণ কঠিন।

কতবার যে জব্দ হয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। যেই গর্জন করে উঠেছি, 'এই চোপ, টেলিফোন রেখে দিন বলছি, আগে আমাদের কথা বলতে দিন', সঙ্গে সঙ্গে অপর দ্বৈতকণ্ঠের একটি বঙ্কিম হাস্যে আমাকে বিদ্রূপ করে উঠেছে কি হচ্ছে তারাপদবাবু আর কতদিন এইসব চলবে।'

কি সব চলবে, কি সব চলছিলো—সে সব নিয়ে জবাব দেবার আগেই আমার হাত থেকে একা একা টেলিফোন ঘটাং করে পড়ে যায় আমি রীতিমত ভয় পেয়ে যাই অপরিচিত ব্যক্তির শুধু আমার গলার স্বর চিনে আমাকে ধমকানোয়।

কিন্তু শুধু ভয় পাওয়ার জন্যে নয়, যে যাই বলুক, ক্রশ-কানেকশন আমার ভারি ভালো লাগে, আমি ভারি আমোদ পাই এতে। তবে সবদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে না, এমন দিন যায়, সারাদিন ধরে প্রাণান্ত চেষ্টা করেও একটিও ক্রশ পাই না। শুনতে পাই না, বড়বাজারের গোপন সলাপরামর্শ, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের করুণ সংলাপ কিংবা পরকীয়া প্রেমের আদি রসাশ্রিত প্রণয়কাব্য। এমন বিনিপয়সার নাটক শোনার সুযোগ না পেয়ে যেসব দিন ক্রশ পাই না, আমার মন খিঁচড়ে থাকে। সেই সময় কেউ আমাকে যদি ফোন করে খেপে গিয়ে যেসব কথা শুনবো বলে ক্রশে কান পেতে বসেছিলাম, সেই সব কথা তাকে শুনিয়ে দিই।

আসলে আমার সোজা কথা হলো আমি ক্রশ-কানেকশনের ভক্ত, ক্রশ-কানেকশন পেলে আমি আহ্লাদিত হই, উত্তেজিত হই যার সঙ্গে কথা বলছিলাম বা বলতে যাচ্ছিলাম সে যত দরকারি কথাই হোক না কেন তাকে ফেলে রবাহুত আগন্তুকদের কথা শুনি।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, এমন কি কখনোই হয় না যে এমন জরুরি

কথা বলার আছে যে ক্রশ-কানেকশন যতই রোমান্টিক বা নাটকীয় হোক, সেটিকে উপেক্ষা করেই বলতে হবে।

হ্যাঁ, তা হয় এবং এসব ক্ষেত্রে আমার কোনো অসুবিধাই হয় না। জরুরি কথার মধ্যে সেই অপর দুই ব্যক্তির আলাপ ঢুকে পড়ে, আমি আস্তে গলার স্বর নামিয়ে বলি, 'হ্যালো, ট্রাঙ্ক, টেলিফোন রেখে দিন, জরুরি ট্রাক-কল আছে।' আর কিছু বলতে হয় না, পরপর দুটো খটাং করে শব্দ হয়, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় টেলিফোন নামিয়ে ট্রাঙ্কের জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তবে কখনো কখনো একটা অসুবিধা হয় আমি যার সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনিও দুম করে টেলিফোন নামিয়ে ফেলেন, কিন্তু তিনি যদি এত বোকা হয়, এবং আমার কণ্ঠস্বরও বুঝতে না পারেন, তা হলে কি আর করা যাবে ?

সিগারেট

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। একদিন বিকেলবেলা একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছি, কিছুক্ষণ ধরেই দেখছি একজন ভবঘুরে জাতীয় লোক পার্কের ভিতরের রাস্তা থেকে, ঘাসের উপর থেকে পোড়া সিগারেটের টুকরো কুড়োচ্ছে। চিরকালই আমার পরোপকার প্রবৃত্তি অতি প্রবল, আমার পায়ের কাছেই পড়ে ছিলো কয়েকটি রীতিমত বড় বড় অর্ধেক খাওয়া সিগারেটের দগ্ধাংশ, নিশ্চয়ই কোনো অস্থিরমতি ব্যক্তি এই বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ আগে অধিষ্ঠান করে গেছে, তারই স্মৃতি-চিহ্ন পড়ে রয়েছে এখন আমার পদপ্রান্তে। আমি সেই ভবঘুরে জাতীয় লোকটিকে ডাকলাম, ডেকে দেখালাম সেই বৃহদাকার সিগারেটের টুকরোগুলি ; দুঃখের বিষয় এই রত্নভাণ্ডারটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো সত্ত্বেও তাকে খুব উত্তেজিত বা সন্তুষ্ট মনে হলো না। সে এগিয়ে এসে মাটির উপর থেকে একটি

সিগারেট কুড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকালো যেন শুধু এইটুকু বোঝানোর জন্যে যে সে আমার অনুরোধেই এই কাজটি করছে, তারপর সংগৃহীত সিগারেটটি বেশ অভিনিবেশ সহকারে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে আবার মাটিতে ফেলে দিলো নিতান্ত অবহেলাভরে। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার বেশ বড় টুকরো তো, ফেলে দিলে কেন? লোকটি শক্ত চোখে আমার দিকে তাকালো তারপর অত্যন্ত কঠিন অভিজাত গলায় বললো, 'ক্যাপস্টান ছাড়া খাই না।' বলা বাহুল্য তখন ক্যাপস্টান ছিলো অতি বনেদি সিগারেট এবং বাজার-চালু ব্র্যাণ্ডগুলির মধ্যে সবচেয়ে দামি।

শুধু এই ভবঘুরেটির মধ্যে নয় আমি অসংখ্য ধূমপায়ীর মধ্যে এই প্রবণতাটি লক্ষ্য করেছি। নিজের পয়সায় সিগারেট খাবে না, অন্যের সিগারেট খাচ্ছে কিন্তু তার পছন্দ মত দামি ছাপের সিগারেটটি না পেলে চলবে না।

সে যা হোক যে যেভাবে পারেন তাঁর সাধের সিগারেট সংগ্রহ করুন তাতে আমার নিশ্চয় কোনো আপত্তি থাকা উচিত হবে না। কিন্তু আমার একটা দুঃখ আছে অন্য একটা বিষয়ে। এর-ওর বাড়িতে যাই গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর গাদাগাদা দেশি বা বিদেশি মহামূল্য সিগারেট, কারোর জামাইবাবু বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে, কারোর বন্ধু সিগারেট কোম্পানিতে কাজ করে কিন্তু নিজে সিগারেট খায় না সে তার নিজের মাসিক কোটা থেকে প্রাপ্য অংশ উপহার পাঠিয়েছে, কারোর ছাত্রী পরীক্ষায় পাশ করে নিউ মার্কেটের আশপাশ থেকে খুঁজে খুঁজে চোরাই সিগারেট কিনে মাস্টারমশাইকে অভিনন্দন জানিয়েছে—এই রকম কত বিভিন্ন বিচিত্র পথে কত লোকের কাছে সিগারেটের পাহাড় এসে জমা হয়, কিন্তু কোনোদিন আমার ক্ষেত্রে এরকম হলো না। কেউ কোনোদিন একটা বিড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলো নি, 'নাও তারাপদ টানো।'

ফলে আমি চিরকাল নিজের পয়সায় কম দামি সিগারেট খেয়েছি এবং সবাই ক্রমাগত পরামর্শ দিয়েছে, 'অত বাজে সিগারেট খেয়ো না, মারা পড়বে।' আমি অবশ্য মারা পড়িনি কিন্তু ইতিমধ্যে একটি বড় ঘটনা ঘটে

গেছে। ভালো-বাজে সিগারেট বলে কিছু নেই এখন আর সব সিগারেটের গায়েই এখন নামাবলী জড়ানো 'সাবধান। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর!'

ধূমপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক এ কথা এখন সকলেই জানে। বৎসরে বৎসরে পৃথিবীর নামকরা সব শহরে দ্বিগ্বিজয়ী ডাক্তার ও সার্জনেরা সমবেত হোক, সেখানে সাংঘাতিক আলোচনা হয় ধূমপানে গলা ও লাঙ্গসের ক্যানসারে কত লোক কি ভাবে অকালে মারা যাচ্ছে তাই নিয়ে। একবার এইরকম একটি কর্কট রোগ চিকিৎসকদের আন্ত-র্জাতিক সম্মেলনের বিস্তৃত রিপোর্ট আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো একটি ডাক্তারি পত্রিকায় এক ডাক্তার বন্ধুর চেম্বারে বসে। আদ্যোপান্ত পাঠ করে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো, পায়ের নখ থেকে মাথারচুল পর্যন্ত আগাগোড়া ভিতরে বাইরে কর্কট রোগের সমস্ত লক্ষণ আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম। ডাক্তার বন্ধু আমার অবস্থা দেখে মৃদু হেসে বললেন, কি রকম বুঝলে?' আমি বললাম, 'আর কি, প্রাণে বেঁচে আছি, এই আশ্চর্য!' ডাক্তার বন্ধু বললেন, 'জানো এই নিবন্ধটির মর‍্যাল কি?' আমি বললাম, 'রিপোর্টের আবার মর‍্যাল কি? একি গল্প না নীতি-কথা?' ডাক্তার বন্ধু জবাব দিলেন 'পুরো আলোচনাটি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে আমি একটি তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছি, সেটি হলো তুমি যদি সিগারেট খাও তবে তোমার লান্সসে বা গলায় ক্যানসার হবে আর যদি না খাও তাহলে তোমার পেটে, পিঠে মূত্রাশয়ে বা শরীরের অন্য কোথাও চোখে, নাকে, কানে ক্যান্সার হবে। এখন বেছে নাও কি করবে?' এই বলে সুহৃদ চিকিৎসক আমার কমদামি সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট দয়া করে অবহেলাভরে তুলে নিয়ে ধরালেন।

এর পর থেকে আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি এবং অল্প চেষ্টাতেই আমি জেনে গেছি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়া খুব সহজ এবং বহুবার সিগারেট ছেড়ে দিয়ে এটা আমি যথেষ্টই প্রমাণ করেছি। কিন্তু অসুবিধা হয়েছে কিছু বাজে লোককে নিয়ে, সিগারেট ছেড়ে দিলেই তারা কি করে টের পায় দামি বিলিতি সিগারেটগুলো তারা পকেট থেকে বের করে বলে, "কি চলবে নাকি?' আমি জানি একটা সিগারেটও যদি ওদের প্যাকেট

থেকে নিই ওরা জীবনে আমার আর মুখ দর্শন করবে না। আমার এইভাবে বেশ কিছুদিন চলে, তারপর একদিন আবার এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট কিনে ব্রতভঙ্গ করি, কেউ খেয়াল-ও করে না।

ডক্টর

ভারত সরকারের পেটেন্ট দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমার নিকট প্রতিবেশী। সেই সূত্রে ডক্টর মহানন্দ রায় চৌধুরী একদিন আমার বাড়িতে এলেন, ঐ উচ্চপদস্থ ভদ্রলোককে ধরে তিনি তাঁর নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রটির একটি পেটেন্ট নিতে চান।

ডক্টর রায়চৌধুরীর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলার পর বুঝতে পারলাম তাঁর এই নতুন যন্ত্রটি সম্পর্কে তিনি ভীষণ রকম উচ্চাভিলাষী, তাঁর ধারণা হয়েছে এই যন্ত্রটি বাজারে ছাড়া মাত্র হু-হু করে কাটতে থাকবে, তাই যাতে অন্য অসাধু লোকেরা এই রকম যন্ত্র বানিয়ে ডক্টর মহানন্দের ক্ষতি না করতে পারে, সেই জন্যে তিনি বাজারে দেওয়ার আগেই যন্ত্রটি একটা পেটেন্ট নিতে চান।

প্রথমেই আমার উচিত ডক্টর মহানন্দ রায়চৌধুরীর সঙ্গে সর্বসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেয়া। অবশ্য আমার মতই তাঁকে ইতিমধ্যে চিনে ফেলেছেন এমন লোকের সংখ্যা খুব কম নয়।

অনেকে বলেন, রায়চৌধুরীর ডক্টরেটটি নিতান্তই ফাঁকা এবং ভুয়ো, আসলে তিনি এইচ এম বি, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। স্কুলের সীমানা নাকি পেরুনো সম্ভব হয়নি তাঁর। চতুর্থবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একই সঙ্গে অকৃতকার্য হয়েছিলেন এমন একজন জলজ্যান্ত সাক্ষী নাকি এখনো বিদ্যমান। রায়চৌধুরী নাকি ম্যাট্রিকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অবশেষে কম্পাউণ্ডার হন, সেই ১৯৪২-৪৩ সালে ইন্টার ন্যাশনাল ফার্মেসিতে তাঁর হাতের তৈরী

অব্যর্থ ম্যালেরিয়ার মিকশ্চার খেয়ে এখনো প্রাণে বেঁচে আছে এমন লোকের সংখ্যা কালীঘাট-ভবানীপুরে অনেক।

কি করে মহানন্দ এলোপ্যাথিক কম্পাউণ্ডারি থেকে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হলেন, এবং ডকটরেট হলেন সে অনেক গবেষণার বিষয়। আমাদের অত সময় নেই, ধৈর্যও নেই।

আসলে আমি যখন থেকে চিনি, তখন থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ ডক্টর মহানন্দ রায়চৌধুরী বলেই চিনি; তখন তিনি একেবারে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক, হোলটাইম। খবরের কাগজে নিয়মিত-অনিয়মিত তাঁর নাম বেরোয় সেই সময়ে; পাড়ার শেষ প্রান্তে তাঁর ভাঙা দোতলাবাড়িটি তখনই রীতিমত দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। একসঙ্গে দুটি গ্রামোফোনে একই রেকর্ডে একই গান দুই সেকেণ্ডের ব্যবধানে বেজে গেলে যে ধ্বনিলয়ের আধিভৌতিক সমাবেশ হয় অথবা গাছের মগ-ডালে পাখির বাসার মতই কিন্তু বেশ বড় আকারে বাসা বানিয়ে তার মধ্যে কাবুলি বেড়াল পুষলে সেই বিড়ালের বংশধরেরা কোনো রকম উড্ডনশীলতা অর্জন করে কিনা ইত্যাদি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ডক্টর রায়চৌধুরীর খ্যাতি তখনই ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে।

ডক্টর রায়চৌধুরী কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন একটি সামান্য যন্ত্র উদ্ভাবন করে। যন্ত্রটির ঠিক কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিলো এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু উপকথার সেই সুবিদিত দৈত্যকে পরিহাস করবার জন্যেই বোধহয় মহানন্দ যন্ত্রটি তৈরী করেন। যন্ত্রটি আর কিছুই নয়, কুকুরের লেজ সোজা করার যন্ত্র; দুটো চওড়া কাঠের ফালির মধ্যে বাচ্চা কুকুরের লেজের ছাঁচে লম্বা গর্ত, তার সঙ্গে স্ক্রু এবং বল্টু দিয়ে মাপসই করার ব্যবস্থা; কুকুরের বাচ্চা জন্মাবার পর চোখ ফোটার আগেই তার লেজের ভিতর এই জিনিষটি ঢুকিয়ে বেঁধে দিতে হবে, একুশ দিন পরে খুলে নিলে দেখা যাবে লেজের সেই স্বাভাবিক অর্ধ-বৃত্তাকারে ভাব আর নেই; তার বদলে একেবারে সরলরেখার মত সোজা, এবং আমৃত্যু এইরকম সোজাই থাকবে।

দুঃখের বিষয়, এই যন্ত্রটি একেবারেই চালু হয়নি। একটি যন্ত্রই ছিলো

তাও এতদিনে স্ক্রু, বল্টু মরচে ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। সেই যন্ত্রে যে কয়েকটি শিশু কুকুরের লেজ শাসিত হয়েছিল, সেই সরললেজ কুকুরমণ্ডলীর একটিও এখন আর বেঁচে নেই।

এ সবই পুরনো কথা। এখন যে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রটির পেটেণ্ট নিতে চাইছেন ডক্টর মহানন্দ রায়চৌধুরী, বৈচিত্র্যে সারল্যে এবং প্রয়োজনীয়তায় তার কোনো তুলনা মিলবে না।

এই যন্ত্রটির উদ্ভাবনের পিছনে শুধু ডক্টর রায়চৌধুরীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাই নয় তাঁর সমাজকল্যাণ বোধও নিহিত। যন্ত্রটির তিনি আপাতত নাম দিয়েছেন, 'অনন্ত কল'। তবে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে করতে তিনি স্পষ্টই বললেন যে, তাঁর বিশ্বাস কিছুকালের মধ্যেই লোকে এটিকে অনন্ত না বলে মহানন্দ কল বলবে, এই অসামান্য কলটিই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে যেমন বাঁচিয়ে রেখেছে ডানলপ টায়ার কিংবা ফোর্ড গাড়ি তার জন্মদাতাদের।

প্রিয় পাঠক্-পাঠিকা, ধৈর্য হারাবেন না! অনন্ত কলটি আমি এখনই বর্ণনা করবো। অনন্ত কল এই নামেই হয়তো কিছুটা অনুমান করা যাচ্ছে। আমিও বোঝানোর চেষ্টা করছি জিনিসটা অতি সহজ, যদি কঠিন মনে হয় সে আমার বোঝানোর দোষ।

অনন্ত কল আসলে কয়েকটি ছোট যন্ত্রের সমাবেশ। প্রথমে একটি সাধারণ হিটার বা ইলেকৃট্রিক সুইচ অন করে দিলেই চলবে। সেই হিটারের উপরে একটা ছিদ্রহীন ঢাকা গামলায় এক কেজি বরফের টুকুরো। ঢাকা গামলায় সঙ্গে নল লাগানো, হিটারে কিছুক্ষণ তাপ দিলেই প্রথমে বরফ গলে জল হবে, তারপর আরও তাপে জল ধোঁয়া হবে।

এই ধোঁয়া এবার নল দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এই নলটা আবার চলে গেছে একটা জল ভতি মগের মধ্য দিয়ে, জল-ভতি মগে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নলের ভিতরে ধোঁয়া আবার বিন্দু-বিন্দু জলে পরিণত হবে। নলটা ঘুরে আরো এগিয়ে গেছে একটা ছোট বরফ তৈরীর চেম্বারের মধ্য দিয়ে, নলের মধ্য দিয়ে জল গড়িয়ে গিয়ে সেই বরফ-চেম্বারে আবার বরফে পরিণত হবে। এবং বরফ-চেম্বারের নিচেই সেই হিটারের উপর গামলা, পুরো এক

কেজি বরফ ধোঁয়া হয়ে তারপর জল হয়ে তার ওপরে যখন আবার এক কেজি বরফে পরিণত হবে তখন সেটা বরফ চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে গামলার মুখে ধাক্কা লাগাবে এবং মুখ সরে গিয়ে বরফ গামলার ভিতরে পড়বে, আবার ধোঁয়া হবে, আবার জল হবে, আবার বরফ হবে। এর কোনো শেষ নেই, অন্ত নেই। তাই অনন্ত কল।

এই কলে যে কোনো অলস বা বেকার ব্যক্তি নিজেকে যতক্ষণ ইচ্ছে নিযুক্ত রাখতে পারবেন। একবার কল কিনলে বিদ্যুৎ মাশুলের সামান্য ব্যয় ছাড়া আর কোনো খরচ নেই। তাপের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে এগারো মিনিট থেকে তেত্রিশ মিনিটে বরফকে আবার বরফ করা যাবে। বড়-লোকের ঘরণী, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, শিক্ষিত বেকার যুবক যাদের সময় কাটানোর কোনো সুযোগ নেই, এই অনন্ত কল তাদের একঘেঁয়েমির হাত থেকে চির অব্যাহতি দেবে।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে ডক্টর মহানন্দ রায়চৌধুরীর কাছে অনন্ত কলের বর্ণনা শুনছিলাম। মনে মনে স্থির করে ফেললাম, অনন্ত কল বাজারে বেরোলেই কয়েকটা কিনতে হবে, কাকে কাকে দেবো মনে মনে তারো একটা সুষ্ঠু তালিকা স্থির করে ফেললাম।

এখন ভারত সরকার ডক্টর মহানন্দের এই অভূতপূর্ব অনন্তকলকে পেটেন্ট দেন কিনা কে জানে? আমি তাঁকে নিয়ে গুটি-গুটি পেটেন্ট অফিসারের বাড়ির দিকে এগোলাম।

যদি পুরাতন প্রেম

কবে এক দার্শনিক বলেছিলেন, প্রেম হল অনেকটা চাঁদের মত। হয় বাড়তে থাকে না হয় কমে যায়। কখনও এক রকম থাকে না, এক জায়গায় এক অবস্থায় স্থির হয়ে থাকে না।

চাঁদের নিত্য কমা বাড়া, নিয়ত হ্রাসবৃদ্ধি। প্রেমকলাও চন্দ্রকলার মতই এক ফালি ঈদের চাঁদ থেকে বেড়ে বেড়ে পূর্ণশশীতে বিকশিত হয়ে ওঠে তারপর কমতে কমতে একেবারে শূন্য, পূর্ণ অমাবস্যা।

এই সামান্য কথিকায় অত উত্থান পতন, জটিলতার মধ্যে যাব না। বরং আগে মালতীর গল্পটা বলি।

মালতীর সঙ্গে সুবোধের জোর প্রেম। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা সদা-সর্বদা সুবোধ মালতীদের বাড়িতে পড়ে আছে। বাইরের ঘরে প্রেমিক-প্রেমিকা গুজগুজ ফুসফুস করছে। সেখানে স্বভাবতই তাদের বিরক্ত করতে কেউ আসে না।

এর মধ্যে একদিন সকালে কি একটা দরকারে সুবোধকে বাইরের ঘরে বসিয়ে মালতী বাড়ির মধ্যে গেছে। এসে দেখে তার রাশভারি ডাক্তার বাবার সঙ্গে সুবোধ গলা নামিয়ে কি যেন বলছে। মালতীকে আসতে দেখে সুবোধ থেমে গেল। ডাক্তারবাবু তাকে বললেন, "তুমি বিকেলে চেম্বারে এসো", বলে চলে গেলেন।

মালতীর বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না যে সুবোধ তার বাবার কাছে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, এ বিষয়ে কোনো উচ্চ-বাচ্য করল না।

কিন্তু বিকেলে বাবার সঙ্গে চেম্বরে কি কথা হল কে জানে, সুবোধ আর এল না। এল না তো এলই না। সেই বিকেল কেন, তারপর তিনদিন চারদিন সুবোধের পাত্তা নেই।

মালতী গিয়ে তার বাবাকে ধরল, "বাবা। তুমি যে সেদিন সুবোধকে চেম্বারে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলে, তুমি তাকে কি বলেছ? তারপর থেকে সুবোধ আর আসে না কেন?"

ডাক্তারবাবু ভ্রু কুঁচকে বললেন, "সুবোধ? মানে তোমার বন্ধু সেই ছেলেটা? আরে সে তো আমার কাছে একশটা টাকা চাইল। বিকেলে চেম্বারে গিয়ে নিয়ে এল। আমি তো তাকে খারাপ কিছু বলি নি, সে বুঝি আর আসছে না!"

প্রথম গল্পটাই কেমন ম্যাটমেটে হয়ে গেল। অন্য এক সুবোধ-মালতীর গল্প বলি।

এক ইংরেজ কবি বলেছিলেন, একেবারে ভাল না বাসার চেয়ে ভালবেসে বিনাশ হয়ে যাওয়া ঢের ভাল। আমাদের এই দু-নম্বর সুবোধ পার্কের ঘাসের উপরে বসে মালতীকে বলছিল, প্রায় ঐ কবির ভাষায়, "মালতী, আমার মালতী, তোমাকে ভালবেসে আমি সব কিছু এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও রাজি আছি।"

এমন সময়, যেমন হয় আর কি, কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় ফোঁস ফোঁস করতে করতে তেড়ে এল। সুবোধ তার নাটকীয় বাক্যমালা হঠাৎ মধ্যপথে বন্ধ করে মালতীকে ফেলে রেখে চোঁচা দৌড় লাগাল। সুখের বিষয় ষাঁড়টি আপন উত্তেজনায় ছুটে যাচ্ছিল, সে মালতীকে কিছু বলে নি।

সুতরাং আবার সুবোধ মালতীর কাছে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে মালতী তাকে চেপে ধরল, "তুমি না বলেছিলে, তুমি মৃত্যুর মুখোমুখি পর্যন্ত দাঁড়াতে পার আমার জন্য। আর ষাঁড়টাকে দেখা মাত্র আমাকে ফেলে পালালে কেন?" একটু গুছিয়ে নিয়ে সুবোধ বলল, "আরে বলছিলাম তো মৃত্যুর কথা। ষাঁড়টা তো মৃত নয়, সেটা তো তাজা, তার সামনে দাঁড়াব তো বলি নি। আর দাঁড়াবই বা কোন সাহসে?"

সাহসের কথা থাক। গভীর আবেগের কথা বলি। সেই এক প্রেমিকাকে তার প্রেমিক প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রেমিক ছোকরার মনটা ছিল সাদা, প্রত্যাখ্যান করার পরে তার মনে কেমন চিন্তা হল। আহা, মেয়েটা মনে বড় আঘাত পেয়েছে, যদি আত্মহত্যাটত্যা কিছু করে। সে গেল মেয়েটার কাছে, গিয়ে প্রশ্ন করল, "আমি যে তোমাকে বিয়ে করলাম না, তুমি এই দুঃখে আত্মঘাতী হবে না তো?" মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে বলল, "তা দিয়ে তোমার কি দরকার? তবে তোমাকে জানিয়ে রাখি সাধারণত এ রকম অবস্থায় আমি আত্মহত্যাই করে থাকি।"

সবচেয়ে দুঃখের প্রেমের গল্প শুনেছিলাম এক চায়ের দোকানে। কয়েকজন যুবক প্রেম নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তার মধ্যে এক যুবক

তাঁর এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন, "কি আর বলব যা দিন-কাল পড়েছে। সেদিন রাস্তায় এক আধচেনা মেয়েকে প্রেম নিবেদন করতে গেছি, মেয়েটা কথা নেই, বার্তা নেই পুলিশ ডেকে বসল।" আড্ডার প্রবীণতম যুবকটি এবং সেই বোধহয় আড্ডাপ্রধান এই শুনে বক্তাকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "পুলিশ ডেকে তো ভাল করেছিল। তুমি খুব বাঁচা বেঁচে গেছ। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুত ডাকে। সে রকম হলে একদম ঝুলে যেতে।"

তবে প্রেমের ব্যাপারে সবচেয়ে মর্মান্তিক কথা বলেছিল এক সরলা যুবতী। তাকে তার শুভানুধ্যায়ীরা জিজ্ঞাসা করে, "তোমার পুরুষ বন্ধুটির আসল উদ্দেশ্যটা কি সেটা ধরতে পেরেছ?" যুবতীটি বলেছিল, "না। কি করে ধরব। ও যে সব সময় আমাকে অন্ধকারে রাখছে।"

আত্মনারায়ণ

আজ যখন চতুর্দিকে সমস্তই বিশৃঙ্খল এবং বেনিয়ম, বার বার আত্মনারায়ণবাবুর কথা মনে পড়ে।

অতি বাল্যকালেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ধোঁয়া তা উনুনের ধোঁয়াই হোক আর তামাকের ধোঁয়াই হোক কখনো সোজা লম্বালম্বি উপরের দিকে ওঠে না, গোল হয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ওঠে। তাই প্রথম যৌবনে তিনি যখন তামাক ধরলেন, গড়গড়া থেকে সোজাসুজি নল দিয়ে ধোঁয়া টানতেন না, এতে নাকি ধোঁয়া ঠিকমত বেরিয়ে আসতে পারে না, ধোঁয়ার খুব অসুবিধে হয়।

বিশাল লম্বা গড়গড়ার নল নিজে অর্ডার দিয়ে মোরাদাবাদ থেকে তৈরী করিয়ে আনিয়েছিলেন। সেই আমলের মোরাদাবাদী বাইশ-ইঞ্চি হাতের ত্রিশ হাত।

কলকের টিকেতে আগুন দেওয়ার পরে নল মুখে করে উঠে দাঁড়াতেন আত্মনারায়ণ। তারপর গড়গড়ার চারদিকে বিশাল হলঘরের মত বড় বাইরের বসবার ঘরে, কখনো উঁচু হয়ে চৌপায়ার উপর দিয়ে উঠে কখনো নিচু হয়ে টেবিলের পায়ায় গোল হয়ে নিজেকে নামিয়ে উঠিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তাঁর ধূমপান চলতো।

সত্তর বছর বয়েস হয়ে যাওয়ার পর এতটা আর পেরে উঠতেন না আত্মনারায়ণ। তখন একটা লম্বা শালগাছের গুঁড়ি বসবার ঘরে ছাদ ও মেঝের মধ্যে আড়াআড়িভাবে ফেলে নিয়েছিলেন ; পুরো নলটা উপরে নিচে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে তাঁর মুখের কাছে ইজিচেয়ারে এসে পেঁছাতো. তাতে চোখ বুজে একটা করে সুখটান দিতেন, আর স্বগতোক্তি করতেন. 'এভাবে কি ধোঁয়ার স্বাদ থাকে?'

একবার কলকাতায় এসে, তখন তাঁর প্রৌঢ় বয়েস, তিনি ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে সবচেয়ে সামনের সারিতে বসে লক্ষ্য করেছিলেন, ট্রাম চালানো কাজটা খুব কঠিন নয় শুধু পা দিয়ে ঘণ্টা বাজানো আর হাত দিয়ে হ্যাণ্ডেল চালানো তাহলেই ট্রামগাড়ি লাইন-বরাবর চলবে।

আত্মনারায়ণ অনেক ভেবে-চিন্তে বুঝতে পারলেন, প্রথম শ্রেণীর সামনে দিকটা একটু এগিয়ে দিলেই সেই সিটে বসে যে কোনো যাত্রী ট্রাম চালিয়ে নিতে পারবে।

ট্রাম কোম্পানিকে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন তিনি। গাড়ি যখন এত সহজ পদ্ধতিতেই চালানো সম্ভব, শুধু শুধু মাইনে দিয়ে একগাদা ড্রাইভার পুষে লাভ কি? ট্রাম কোম্পানি আত্মনারায়ণের চিঠির উত্তরে বিনীত ভাবে জানিয়েছিলো যে, যাত্রীরা কি গাড়ি চালাতে রাজি হবে। আত্মনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'যে যাত্রী চালাবে তার কাছ থেকে ভাড়া নেবেন না ; তা হলেই যাত্রীর অভাব হবে না।' ট্রাম কোম্পানি কয়েক দিন পরে প্রশ্ন পাঠালো, কিন্তু স্যর, যখন গাড়ি খালি থাকবে, কোনো যাত্রী থাকবে না?' আত্মনারায়ণ জবাবে জানালেন, তখন তো কণ্ডাক্টর বেকার, সেই চালাবে। তারপর একজন যাত্রী উঠলেই সে চালাবে, তার কাছ থেকে টিকিট নেওয়া হবে না, পরের যাত্রীরা উঠলে তখন টিকিট

নেওয়া হবে, শুধু আগের যাত্রী-চালক নেমে গেলে আরেকজন চালাবে, তারও ভাড়া লাগবে না। এইভাবে চলবে, লাষ্ট স্টপ পর্যন্ত যদি কোনো প্যাসেঞ্জার না থাকে কণ্ডাক্টর নিজেই চালিয়ে গাড়ি ডিপোতে ঢুকিয়ে দেবে।

দুঃখের বিষয়, আত্মনারায়ণের সঙ্গে তখনকার ট্রাম কোম্পানির ইংরেজ পরিচালকমণ্ডলী আর পত্রালাপ বা অন্য কোনোরকম আলোচনায় যান নি। আত্মনারায়ণ এই নিয়ে সারা জীবন ধরে আক্ষেপ করে গেছেন, তখনই বুঝেছিলাম, ব্রিটিশ জাতটা একেবারে অধঃপাতে গেছে, ওদের আর সাম্রাজ্য চালাতে হবে না।'

এসব প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। ট্রাম কোম্পানির সদর দপ্তরের পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলে হয়তো এখনো এই যুগান্তকারী প্রস্তাবটি এই দুর্দিনে পুনর্বিবেচনার জন্যে উদ্ধার করা যায় এবং এখনো কার্যকর করতে পারলে হয়তো ট্রামের ভাড়া বাড়াতেই হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে রেল দপ্তরকে অনুরোধ করবো তাঁদের দপ্তরেও আত্মনারায়ণের একটি পুরনো প্রস্তাব পড়ে রয়েছে, সেটি যদি বিবেচনা করেন। অবশ্য অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন বিদ্যুৎরেল চালু হয়েছে, এখন হয়তো সেই প্রস্তাব কার্যকরী করা যাবে না। তবুও বহু অঞ্চলে এখনো তো কয়লায় ট্রেন চলছে এবং অনেক দিন চলবে।

আত্মনারায়ণের মূল প্রস্তাবটি সংক্ষিপ্ত-ভাবে আমরাও বিবেচনা করে দেখতে পারি ঃ

কয়লার সাহায্যে যে রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলে সেই কয়লার উত্তাপ অনেকটাই অব্যবহৃত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ইঞ্জিনের এবং বয়লারের গায় উপরে-নীচে তিন সারি করে দুই দিকে একেক সারিতে টানা ছয় ইঞ্চি পরপর এক-একটা দশ ইঞ্চি ব্যাসের বেশ বড় সাইজের উনুন করা চলে। 'এতে প্রত্যেক সারিতে কমবেশী চল্লিশটা করে উনুন ধরবে তাহলে দুই দিকে তিন সারি করে সবশুদ্ধ মোট দুশো চল্লিশটা একটা লাইনে সকালের দিকে যদি যাত্রীগাড়ি আর মালগাড়ি মিলিয়ে চারটে আর চারটে আটটা ট্রেন যাতায়াত করে তাহলে প্রায় দু' হাজার উনুন হয়ে যাচ্ছে। এই উনুনগুলোর

জন্যে কোনো আলাদা কয়লায় দরকার নেই, ইঞ্জিনের উত্তাপেই এদের যথেষ্ট হয়ে যাবে।

এখন এই উনুনগুলোর পাশ দিয়ে লম্বা রেলিং করে রান্না করার জন্যে দাঁড়ানোর জায়গা করে দিতে হবে। তারপর পার্শ্ববর্তী স্টেশন এলাকাগুলির গৃহস্থদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করে নিতে হবে। যার যে স্টেশনে বাড়ি সেখান থেকে রান্নার জিনিসপত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে উঠবে রান্নার বিস্তৃতি ও পরিমাণের উপরে নির্ভর করে যার যে কয় স্টেশন পরে সম্ভব হবে রান্না শেষ করে সেখানে নেমে ফিরতি ট্রেনে ফিরে আসবে। এক টাকার মান্থলিতে বেশ কয়েক স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া আসা চলে (সেই আমলে), কিন্তু এক টাকার কয়লা বা অন্য জ্বালানিতে সারা মাস রান্না করা যায় না বাড়িতে। ফলে অনেকেই এই প্রস্তাবে রাজি হবে।'

জানি না, আত্মনারায়ণের এই প্রস্তাবে রেলগাড়ি কেন সায় দেয়নি, তাতে অন্তত ট্রেন প্রতি আড়াইশো মান্থলি বেশি বিক্রি হবে, জাতীয় সম্পদ কয়লা তারও অপচয় কমবে। রেল-দপ্তর এর চেয়ে অনেক জটিল ও স্বাভাবিক সব পরিকল্পনা ইতিমধ্যে করেছেন, আত্মনারায়ণের প্রস্তাবটিও খুঁজে বের করে একবার বিবেচনা করুন।

অভিজ্ঞতা

আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'গোবিন্দবাবু, কাপড়-কাচা সাবান খেতে কিরকম লাগে ?'

কিংবা 'কেরোসিন তেলের স্বাদ কেমন ?'

আপনার একমাত্র প্রতিক্রিয়া হবে উত্তর না দেওয়া। আপনি হয়তো হেসে ফেলবেন, এমনকি প্রশ্নকারী ইয়ার্কি করছে ধরে নিয়ে রেগেও যেতে পারেন। আপনার সন্দেহ হতে পারে যে এই জিজ্ঞাসু ব্যক্তিটি নির্বোধ

অথবা উন্মাদ কিংবা বিপরীতক্রমে এই ব্যক্তিটি আপনাকে ঐরকম অর্থাৎ বোকা বা পাগল কিছু ঠাউরেছে।

আসলে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে দেখবেন প্রশ্ন দুটি আপাততঃ যতটা বাজে, অবান্তর, উদ্ভট বলে মনে হচ্ছে ঠিক তা নয়। কোনো না কোনো উপায়ে আমরা সবাই সাবান ও কেরোসিন তেলের স্বাদ কি রকম সেটা খুবই ভালই জানি।

কিন্তু আমরা কখনোই কেরোসিন তেল খেয়ে দেখিনি। সাবান-ও খেতে হয়নি কখনো। হয়তো মুখে মাখতে গিয়ে বা দাড়ি কামাতে গিয়ে আমরা হঠাৎ কখনো গায়ে মাখা কিংবা দাড়ি কামানোর সাবানের স্বাদ জিভে পেয়েছি, কিন্তু কাপড়-কাচা সাবানের স্বাদ? একটু চেষ্টা করলেই সেই স্বাদ কিরকম ভালোভাবে মনে করতে পারি। তাহলে আমরা কি কখনো কাপড়-কাচা সাবান বা কেরোসিন তেল খেয়ে দেখেছি?

নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু এগুলোর স্বাদ আমরা জানি, খুব স্পষ্ট করেই জানি। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, এই স্বাদের স্মৃতি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে জন্মসূত্রে এই অভিজ্ঞতা, মানুষের আরো দশরকম অভিজ্ঞতার মতই আমরা অর্জন করেছি।

কিন্তু আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা, তাঁরাই বা এই স্বাদ কি করে জানলেন? একথা কল্পনা করা কঠিন (এবং উচিত নয়) যে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা গ্যালন-গ্যালন কেরোসিন তেল কিংবা ঝুড়ি ভর্তি সাবান খেতেন।

তাহলে এই রহস্যের কোনো সমাধান নেই। পায়ের উপর দিয়ে একটা চিকন লম্বা ঠাণ্ডা সাপ সরসর করে কিলবিলিয়ে চলে গেলে কি কদাকার অনুভূতি হয় তা কি কেউ জানে না? অবশ্য জানে নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু কটা লোকের পায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যাওয়ার মত মহৎ ঘটনা ঘটবার সৌভাগ্য জীবনে হয় এবং হওয়ার পরেও তাঁর জীবন থাকে কি-না এসব প্রশ্ন অজানা রেখেও আমরা সবাই সাপ পায়ের উপর দিয়ে চলে গেলে কেমন লাগে খুব ভালো ভাবে জানি।

দশতলা বাড়ির ছাদ কিংবা এরোপ্লেন থেকে পড়ে গেলে কেমন বোধ হয়। মাটিতে পড়ার পর কেমন বোধহয় এ-প্রশ্নের জবাব প্রত্যাশা করা

অনুচিত। কিন্তু পড়তে-পড়তে আকাশপথে যে কয়েক সেকেণ্ড ভাসমান বা উড্ডীয়মান অবস্থায় কাটে সেই সময় কেমন লাগে ?

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও আমরা সবাই কিন্তু কম-বেশি মোটামুটিভাবে জানি পড়ে যাওয়ার সময় কেমন বোধ হয়। স্বপ্নে উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘুমের মধ্যে প্রায়ই ঘটে।

এই সব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমাদের মত সাধারণ লোকের মাথাব্যথা নেই। কেরোসিন তেল বা সাবানের স্বাদ সাপের স্পর্শ-সুখ কিংবা আকাশ থেকে পতনের মহৎ অনুভূতি এইসব ব্যাপার নিয়ে মাথা আমাদের ঘামানোর সময় কোথায় ?

কিন্তু সম্প্রতি এক ভদ্রলোক আমার প্রতিবেশী হয়ে এসেছেন তিনি প্রতি রবিবার সকালে একটি বিচিত্র জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার কাছে আসেন। কোথায় কানাডাতে তাঁর এক আত্মীয় কি এক মনস্তাত্ত্বিক রহস্যময় বিষয়ে গবেষণারত, তাঁরই সাহায্যার্থে এই প্রশ্নমালা থেকে উত্তর সংগ্রহ করে তিনি পাঠান। এবং আমাকেই তিনি আদর্শ উত্তরদাতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

প্রথম দিকে উত্তরগুলি আমি শান্ত এবং নিরাসক্ত ভাবেই দিচ্ছিলাম। কিন্তু প্রতি রবিবার সকালে এই ধারাবাহিক অত্যাচার আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তদুপরি প্রশ্নের ধরণ ক্রমশঃ জটিল হচ্ছে। ফলে আমিও এখন মরিয়া হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করছি।

গত রবিবার প্রতিবেশী মহোদয়ের প্রশ্ন ছিলো, 'পাগলা বুনো শূয়োর কামড়ালে কেমন লাগে ?'

সকালে এক কাপ চা খেয়ে খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করছি সেই সময় হাসি-হাসি মুখে এই প্রশ্ন। ইচ্ছে করছিলো ভদ্রলোককে দাঁত খিঁচিয়ে আমি কামড়িয়ে দিয়ে বলি, 'এই রকম।'

কিন্তু হাজার হলেও প্রতিবেশী। নিজেকে যথাসাধ্য সামলিয়ে নিলাম। বরং একটু ব্যাখ্যাশ্রয়ী ভাষায় বললাম, 'যতদূর জানি, পাগলা বুনোশূয়োর কামড়াতে পারে না।'

ভদ্রলোক আমার এই ধরণের জবাবে বিস্ফারিত নেত্রে বলেন, 'সে কি

মশাই ? আমার জানাশুনো কত লোককে পাগলা বুনো শূয়ারে কামড়েছে ?'

মনে মনে বললাম, তাহলে আমাকে জ্বালাচ্ছেন কেন, তাদের কাছেই যান না। কিন্তু মুখে বললাম, 'অসম্ভব, এ হতে পারে না। বুনো শূয়ার পাগলা হলে কখনোই কামড়াবে না, কারণ তখন তার কামড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। বুনো শূয়ার কেন পাগল হয় জানেন ?'

'কেন ?' আমার দিক থেকে এইরকম পাল্টা প্রশ্নবানে ভদ্রলোক অসহায় বোধ করছিলেন।

কিন্তু আমি এখন ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই, আমি বললাম, 'বুনো শূয়ার দাঁত পড়ে গেলে পাগল হয়, তার আগে হয় না। আর সেই জন্যেই দাঁত না থাকার জন্যেই পাগলা বুনোশূয়ার কামড়াতে পারে না। যদি কাউকে কখনো বুনোশূয়ার কামড়ায় বুঝবেন সেটা পাগল ছিলো না।'

ভদ্রলোক কি বুঝলেন জানি না, ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলেন। আজ পরের রবিবার বেলা এগারোটা হতে চলেছে এখনো তিনি এলেন না। আমার কেন যেন কাপড়-কাচা সাবানের ঢেঁকুর উঠছে।

আমার ভাগ্য

আমাদের পাড়া থেকে ফুটবল খেলার মাঠে যেতে পথে একটা বাজার পড়তো সেই বাজারের মধ্য দিয়ে আমরা কয়েকটা কাপড়ের দোকানের ঝাঁপের নিচ দিয়ে খেলার মাঠ যাতায়াতের পথে শট-কাট করতাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা তুই দলের খেলোয়াড়, রেফারি ইত্যাদি সমেত প্রায় আঠারো উনিশজন আমরা একসঙ্গে ফিরছি, আমার হাতেই ফুটবল, আমার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে গমগমে। যখন সেই কাপড়ের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এক বুড়ো মুসলমান ভদ্রলোক এত ছেলের মধ্যে তীক্ষ্ণ

চোখে যাচাই করে নিয়ে আমাকে ডাকলেন। তিনি দোকানদার নন, ক্রেতা। একগাদা ছোট বহরের ডুরে শাড়ি সামনে নিয়ে বাছাই করছেন। তিনি আমাকে ডেকে দাঁড় করিয়ে ভালো করে দেখে দোকানীকে বললেন, 'হ্যাঁ, এইরকমই লম্বা হবে,' এবং এই বলে একটা শাড়ি তুলে নিয়ে আমার কোমরের কাছে ধরে পায়ের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেখলেন; 'আরেক সাইজ বড় চাই' বলতেই দোকানদার আরেক রঙীন ডুরি শাড়ি এগিয়ে এগিয়ে দিলেন, এটা একটু বড়। আবার বুড়ো ভদ্রলোক আমার কোমরের কাছ থেকে মাপ নিলেন এবং খুশি হয়ে সেটাই পছন্দ করলেন।

এতক্ষণ আমি ফুটবল হাতে বিমূঢ় হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। পুরো ঘটনাটা মিনিট দেড়েকের মধ্যে ঘটে গেলো। কোনো এক দূর গ্রামের অপরিচিতা বালিকার সঙ্গে সম-উচ্চতাসম্পন্ন হওয়ার জন্যে তার শাড়ির মাপ দেওয়ার কাজে আমাকে ব্যবহার করা হলো; আমার চারপাশে তখন দেড়-ডজন বন্ধু আমাকে ঘিরে রয়েছে, অনেকেই মুখ টিপে হাসছে।

তখন আমার বারো-তেরো বছর বয়েস হয়েছে! বালকত্ব পার হয়ে প্রায় প্রথমে যৌবনই বলা যায়। এই সময়ে এই ঘটনায় আমার পৌরুষ যেভাবে আহত হয়েছিলো, বিশেষ করে বান্ধব-সমাজে আমার মর্যাদা যেভাবে পতিত হয়েছিলো, তা হয়তো এখন আর কাউকে বোঝানো যাবে না।

আমার জীবনে চিরকালই এইরকম হয়ে আসছে। চিরকাল আমার আশেপাশের লোকেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এমন সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে দিয়েছে যা কল্পনা করাই কঠিন।

একবার আমার বারান্দায় রাত বারোটা থেকে শুরু করে একেবারে ভোর হওয়া পর্যন্ত দুটো হুলো-বেড়াল এমন ঝগড়া করলো, তিনবার বিছানা থেকে উঠে দরজার বার হাতে নিয়ে তাড়িয়ে দিলাম, তবু আবার ফিরে এসে ঘুরে ঘুরে সারারাত ধরে কর্কশ কণ্ঠে ঝগড়া করেই চললো, সেই রাতে একবিন্দু ঘুম হলো না। কিন্তু ভেবে দেখুন পরদিন সকালবেলায় শুনলাম বাড়িশুদ্ধ লোক, এমনকি পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশিনী পর্যন্ত

বললেন যে কাল রাতে আমি নাকি এমন মাতলামি করেছি যে পাড়াশুদ্ধ লোকের সারা রাত ঘুম হয়নি।

হায়, ঈশ্বর, কি করে বোঝাবো! কি করে বোঝাবো যে, কালীপুজোর রাতে মুখে ভুষো কালি মেখে, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে পাড়ার মোড়ে যে লোকটা থানার জমাদারসাহেবকে ভয় দেখিয়েছিলো সে আর যেই হোক আমি নই, সে রকম যোগ্যতাই আমার নেই। কি করে বোঝাবো যে, যে কুকুরটা পাগল হয়ে ধনপতিবাবুকে কামড়িয়ে দেয়, সেই কুকুরকে আমি মাঝে মাঝে সকালবেলা বাসি রুটি খাওয়াতাম বটে কিন্তু সেই জন্যে সে পাগল হয়নি; কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমি কখনো জানতামই না যে কুকুরটা ভবিষ্যতে পাগল হতে পারে, পাগল হয়ে ধনপতি-বাবুকে কামড়াতে পারে। এ ব্যাপারে আমার যে কোনো প্ররোচনা, অভিসন্ধি, কলকৌশল ছিলো না, পাড়ার কেউই বিশ্বাস করতে চায় না, আমাকে আড়ালে পেলেই হেঁ হেঁ করে হেসে বলে, 'দাদা, আপনার মত তুখোড়··· ।'

সেই কবে এক সরল গ্রাম্য ভদ্রলোক শাড়ির মাপ দিয়ে শুরু করেছিলেন তারপর থেকে সারাজীবন ধরে যা নয় তাই। চিরকাল আমি শিশুদের ভালোবেসেছি, আর স্বকর্ণে আড়াল থেকে শুনেছি, শিশুর মায়েরা শিশুদের ভয় দেখাচ্ছে, সাবধান, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, না হলে এখুনি তারাপদকে ডেকে আনবো,' এবং তারপর স্বচক্ষে পর্দার পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছি ভয়ে নীল হয়ে শিশুরা প্রাণপণ খেয়ে নিচ্ছে। একবার-দুবার নয়, এরকম ঘটনা পৌনঃপুনিক দশমিকের মতো আমার জীবনে ঘুরে ঘুরে বারবার।

না হলে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, এই কয়েকদিন আগে চিৎপুর আর লালবাজারের মোড়ে সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আবার সেই একই ঘটনা ঘটলো। কিম্বা বলা উচিত, তার চেয়েও মারাত্মক।

চিৎপুরের এই মোড়টায় কয়েকটা দোকান আছে যেখানে চামড়ার বেল্টে লাগানো ঘুঙুর বেচে। আমি জানতাম এগুলো নর্তকীরা নাচবার

সময় পায়ে পরে নেয়। সেইখানে এক দোকানে এক অভিজাত চেহারার ভদ্রলোক ঐ রকম একটা ঘুঙুর লাগানো বেল্ট কিনছিলেন, হঠাৎ তাঁর কি মনে হলে তিনি বেল্টটা হাতে করে নিজের গলায় একবার লাগিয়ে নিয়ে তারপর আমাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই ঘুঙুরটা শক্ত করে ধরে, দাদা, কিছু মনে করবেন 'না,' শুধু এইটুকু ভূমিকা করে আমার গলায় লাগিয়ে গর্দানের মাপ নিলেন। আমি তো বিস্মিত, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এই মোটা ঘাড়ের মাপের গোদা পায়ের নর্তকী কেমন করে নাচবে? আমার বিস্মিত ভাব দেখে ভদ্রলোক নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, তাঁর প্রিয় ছাগলের গলার মাপটা নাকি তাঁর নিজের গলার চেয়ে একটু চওড়া, প্রায় আমার গর্দানের মত।

শব্দব্রহ্ম

আজ কালীপূজোর পরের দিনের পরের দিন।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চারদিক কেমন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হচ্ছে। সেই প্রাণ কাঁপানো, মন-মাতানো বোমার আওয়াজ, উড়ন তুবড়ির তুরকিনাচন সব নিমেষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। এই শূন্যতার মধ্যে আমার মন হুহু করে উঠছে, কিছুই আর ভালো লাগছে না।

দিন সাতেক আগে, সঠিকভাবে বলতে গেলে গত রবিবার ২১শে অকটোবর ব্রাহ্ম-মুহূর্তে, অর্থাৎ ভোর চারটের কাছাকাছি সময়ে, পাড়ার আর সমস্ত অধিবাসীদের সঙ্গে আমরাও সচকিত হয়ে জেগে উঠেছিলাম। সেই সূচনা, অবশ্য নামমাত্র। একসঙ্গে আটাশটা দোদমা।

প্রিয় পাঠক, দোদমা কাকে বলে জানেন। দোদমা আর কিছুই নয়, দোমুখো সাপের যেমন দুদিকে দুটো মুখ তেমনই একেকটা দোদমায় দুদিকে দুটো করে বোমা বসানো, আগুন দেবার পর একটা বোমা মাটিতে

বিস্ফোরণ হয়, অপরটি আবেগে ফুলঝুরি ছড়াতে ছড়াতে শূন্যে উঠে ফাটে। অবশ্য সদাসর্বদা শূন্যেই ফাটবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, যে কোন সময় এর বাড়ির দোতলার বারান্দায়, ওর বাড়ির তিনতলার ঘরে বা চারতলার ছাদে-ও চলে যেতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে দোদমা খুব গণতান্ত্রিক বাজি, একতলা থেকে চারতলার বাসিন্দা পর্যন্ত প্রত্যেকের পক্ষেই সমান বিপজ্জনক, সমান সুখবহ।

এই আটাশটি দোদমা ২১ তারিখ শেষ-রাত্রে ফাটলো যা দিয়ে আমাদের শ্রুতিযন্ত্রের প্রতিযোগিতা শুরু হলো। এগুলোর নির্মাণকর্তা আমাদের এক প্রৌঢ় প্রতিবেশী পল্টুবাবু। আগে নাকি কোথায় কাশীপুর না ইছাপুরে গান ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন, কিন্তু দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের গান ফ্যাক্টরির চাকরি তাঁর রক্তের মধ্যে কামান-গোলা ইত্যাদির প্রতি এক ধরনের আসক্তি ধরিয়ে দিয়েছে, তারই বার্ষিক বহিঃ-প্রকাশ ঘটে কালীপুজোর সময়।

আমাদের পাড়ার একটি পুরনো ঐতিহ্য আছে। তারই বাহক হলেন হরিহরবাবু। হরিহরবাবুর বয়েস আশি কিংবা কাছাকাছি, তিনি একেবারে বদ্ধ কালা। কানে একেবারেই কিছু শুনতে পান না একথা বলা হয়তো উচিত হবে না, কারণ একদিন সকালবেলায় যখন সাইরেন বাজছিলো নটার সময়, আমি একটা কাজে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। উনি যতক্ষণ সাইরেনটা বাজছিলো কানের কাছে হাত নেড়ে কি একটা অদৃশ্য জিনিস উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পরে সাইরেন থেমে যেতে আমাকে বললেন, 'দিনের বেলায়ও কি মশা!'

তখন চট্ করে বুঝতে পারিনি, পরে হরিহবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে খেয়াল হলো যে আসল মশা নয় ঐ সাইরেন-নির্ঘোষ (একটা সাইরেনের কল একেবারে আমাদের পাড়া ঘেঁষে) হরিহবাবুর কানে মশার পিন্-পিনানির মত বোধ হয়েছে।

এই শব্দসচেতন ঐতিহ্যবাহী হরিহরবাবুই হলেন দেওয়ালির একয়দিন পল্টুবাবুর ইষ্টদেবতা। পল্টুবাবুর বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে রাস্তার বিপরীত দিকে তিনতলায় হরিহবাবুর থাকেন। পল্টুবাবু একের পর এক

দোদমা ফাটিয়ে যান, আর তার তিনতলায় বারান্দায় একটা আরাম-কেদারায় হরিহরবাবু নির্বিকারভাবে বসে থাকেন।

একেকটি দোদমা ফাটিয়ে পরম উৎসাহ-ভরে পল্টুবাবু মুখ তুলে তাকান হরিহরবাবুর বারান্দার দিকে। কিন্তু বৃথাই। তারপর ক্রমশঃ ক্লান্ত ও উত্তেজিত হতে থাকেন পল্টুবাবু, একসঙ্গে দুটো, তিনটে, চারটে করে দোদমার মুখে আগুন লাগাতে থাকেন, সে এক এলাহি ব্যাপার, সারা পাড়া থরথর করে কাঁপতে থাকে, ত্রিসীমানার মধ্যে যত কুকুর-বিড়াল তারা মহাপ্রলয়ের দিনের মহড়া স্বুরু করে দেয়, এমনকি সুদূর আকাশে ভীত, সন্ত্রস্ত কাক-চিল আধ-কণ্ঠে চীৎকার করতে করতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে।

এই রকম কোনো এক সময়ে দেশলাই জ্বাললে যে রকম ফস্ করে শব্দ হয় সেই রকম একটা শব্দ হয়তো হরিহববাবুকে অনুভব করতে পারেন, কারণ তখন তিনি বারান্দার উপর থেকে চেঁচিয়ে পল্টুবাবুকে বলেন, 'পল্টু আর দেশলাই জ্বালাতে হবে না,' পল্টুবাবু পরম উৎসাহভরে শেষবারের মত একসঙ্গে দশটা দোদমায় অগ্নি নিয়োগ করে ক্ষান্ত হন।

এই ক্ষান্তি অবশ্য স্বল্প সময়ের জন্য, কারণ শুধু পল্টুবাবু নন, শুধু দোদমা নয়। হাজার রকমের বাজি, ঐ যে উড়ন তুবড়ি যেটা জানলা দিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীর গামছা, আমার ছেলের একপাটি চটি এবং আমার ডান কানের উপরের অংশ পুড়িয়ে দিয়েছে, এবং ঐ যে ছুঁচো বাজি যেটা এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে, সামনে যাবে না পিছনে যাবে, বাঁয়ে না ডাইনে কিছু বুঝবার আগেই নতুন কেনা টেরিলিনের প্যাণ্ট থেকে রবার পোড়া গন্ধ বেরোবে, এগুলোর বর্ণনা কিছু কিছু রামায়ণ-মহাভারতে আছে, এগুলোর যথাযথ বর্ণনা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমার থেকে দশগুণ প্রতিভাবান লেখকের পক্ষেও অসম্ভব।

আর পল্টুবাবু। পল্টুবাবুর দাদা আছেন, গিন্নি আছেন, নয় ছেলে আছেন, সামান্য উড়ন তুবড়ির সুড়সুড়িতে কিংবা দোদমার আওয়াজে মিথ্যে অমন ভয় পেলে তাঁরা ঘাড় মটকে দেবেন।

ঘাড় মটকানোর প্রয়োজন নেই। সত্যি আমাদের রীতিমত সাধ্যস্ত হয়ে গেছে পুরো ব্যাপারটা। বোমা না ফাটলে বিশ্বসংসার খালি খালি

লাগছে, কোথায় যেন হেমন্তের হিমেল বাতাসে একটা হুহু ভাব, ঘাড়ের কাছটা একটু চুলকোচ্ছে—একটা ছুঁচো বাজি ঘসটালে একটু আরাম হতো। অথবা একটা উড়ন চরকির নখ-আশ্লেষ।

যাই হোক, বেশিক্ষণ আমাকে আক্ষেপ করতে হলো না, এই লেখাটা লিখতে লিখতেই ভীষণ শব্দে পুরো এলাকা আবার আমোদিত হয়ে উঠলো। পল্টুবাবুর বড় শ্যালক ভাইফোঁটা নিতে আসছিলেন। গলির মোড়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর তাঁতের ধুতির আবির্ভাব মাত্র দেওয়ালির শেষ উদ্বৃত্ত চল্লিশটি একসঙ্গে ফাটিয়ে পল্টুবাবু তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। চল্লিশটি দোদমার শব্দ এবং ধোঁয়া কাটলে দেখা গেলো, কোথাও কারোর কোনো চিহ্ন নেই, শুধু একটা পাঞ্জাবির পকেট আর এক পাটি চটি পড়ে রয়েছে।

পরোপকার

অনেকের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে আমার মাথা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ খারাপ।

আমার শুভানুধ্যায়ীরা অনেকে দুপুরের দিকে, অর্থাৎ আমি যখন বাড়িতে থাকি না, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নিতে আসেন। আমি কেমন আছি, আমার পরিবার-বর্গের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কাঁচের গেলাস, আয়না, চশমা ইত্যাদি ভঙ্গুর দ্রব্য ছুঁড়ে ফেলার প্রবণতা আমার কিরকম—এই জাতীয় বহুবিধ প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, পরামর্শ ও উপদেশ আমার পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হতে চলেছে।

একজন সুহৃদ নিজের পকেটের এক টাকা একত্রিশ পয়সা ব্যয় করে একগাছা তিরুলির বিখ্যাত পাগলের বালা আমার স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে

গেছেন, নিকটবর্তী কৃষ্ণপক্ষ মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে আমাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে সেটা পরাতে হবে, তাহলে আর ভয় অথবা চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। পাগলের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান করতে কিম্বা এবং বালা পরতে আমি বাধা দিতে পারি ; আমার স্ত্রী যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে সেই বিশিষ্ট দিনে যথাসময়ে কয়েকজন বলশালী লোক নিয়ে আমার সেই সুহৃদ আমার স্ত্রীকে সাহায্য করতে আসবেন বলে জানিয়ে গেছেন।

আরেকজন একটি দাতব্য মানসিক চিকিৎসালয়ের দরখাস্ত ফর্ম রেখে গেছেন। সেই ফর্মে কিছুই করতে হবে না, শুধু আমার স্ত্রী ও ভাই এবং দুজন প্রতিবেশী মাননীয় পুলিশ কমিশনার বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করবেন যে সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে অবিলম্বে আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কোনো মানসিক ওয়ার্ডে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এর জন্যে বিশেষ তদন্তের প্রয়োজন হবে না। যে কোনো দুই বা তিন কিস্তি 'কথায় কথায়' আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দিলেই কমিশনার সাহেব আবেদনের যৌক্তিকতা এবং গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

এই দ্বিতীয় ভদ্রলোক নিতান্ত বেপরোয়া। যেদিন দরখাস্ত ফর্ম এনেছিলেন, তার পরদিনই খোঁজ নিতে এলেন কতদূর কি হলো। যখন আমার স্ত্রীর কাছে শুনলেন যে, আমি সেই দরখাস্ত ফর্ম দেখে রেগে গিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, তিনি কপাল চাপড়িয়ে 'হায়-হায়' করে উঠলেন এবং 'আর দেরি নয়, আর দেরি নয়' এই বলে দ্বিতীয় ফর্ম সংগ্রহের জন্য আমাদের বাড়ি থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন। বোধহয় ইচ্ছা ছিলো সেদিনই আরেকটি ফর্ম নিয়ে আসবেন।

দুঃখের বিষয়, সেদিন উল্টো রথের জন্য আমাদের অফিস কয়েক ঘণ্টা আগে ছুটি হয়ে গিয়েছিলো। উনি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমিও ট্রাম থেকে নেমে ফিরছি। একেবারে মুখোমুখি দেখা। তিনি আমাকে দেখে একেবারে ভূত দেখার মত চমকিয়ে উঠলেন। আমি ঠিক করে ফেললাম এঁকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

সোজাসুজি বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?' ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'এই তোমার বাড়িতে।' আমি বললাম, 'আমিও আপনার বাড়ি হয়েই আসছি।'

ভদ্রলোক কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন, 'আমার বাড়িতে, এই ভর দুপুরে আমার বাড়িতে কি জন্যে?' তাঁর গলা কেমন যেন শুকিয়ে এলো। আমি বললাম, 'আপনার গলা কেমন শুকিয়ে গেছে একটু জল খেয়ে নিন।' বলে তাঁকে পাশেই মোড়ের মুখে টিউবওয়েলের কাছে প্রায় ঠেলে নিয়ে গেলাম। বহুদিন অভ্যাস নেই মনে হলো, ঘাড় গুঁজে টিউবওয়েলের মুখে মুখ লাগিয়ে জল খেতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু আমি ছাড়লাম না, কর্কশ গলায় 'আরো খান, আরো খান' হুকুম করে প্রায় এক গ্যালন জল খাওয়ালাম। যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তখন টইটম্বুর জল খেয়ে টক্টক্ করে টলছেন, সাদা জল খেয়ে কাউকে এর আগে এতো বেসামাল হতে দেখিনি।

অবশ্য একটু পরে সামলিয়ে নিলেন এবং ঠিক তখনই আবার হুঁশ হলো তাঁর 'আমার বাড়িতে কেন গিয়েছিলে?'

আমি তাঁর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। গল্পে-উপন্যাসে পড়েছি পাগলেরা মারাত্মক কিছু করার আগে এইভাবেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। তিনি বেশিক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সমর্থ হলেন না, ভয়ে ভয়ে মাথা নামিয়ে নিলেন। এইবার আমি তাঁর একটু আগের প্রশ্নের জবাব দিলাম, হিমশীতল কণ্ঠে বললাম, 'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম পেটানোর জন্যে।'

'পেটানোর জন্যে', সদাশয় পরোপকারী বন্ধু, হার্টফেল করেন আর কি, 'কাকে পেটানোর জন্যে?'

ভদ্রলোলের উৎকণ্ঠা দেখে বড় আনন্দ হলো, মৃদু হেসে বললাম, 'কাকে আর? আপনিও বাড়ির বাইরে, আপনার স্ত্রীও অফিসে। প্রথমে ঠেঙালাম আপনার চাকরকে, সে দরজা খুলে দিতেই তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলাম, কিন্তু সে ব্যাটা মহা ধড়িবাজ। সে উঠে দাঁড়াতেই টেবিলের উপর থেকে যেই তাকে আপনার টাইমপিসটা ছুঁড়ে মারলাম ব্যাটা ছুটে

গিয়ে রান্নাঘরে দরজা আটকিয়ে চেঁচাতে লাগলো। তারপরে পেটালাম আপনার ছোট ছেলেটিকে। কিন্তু যাই বলুন আপনার বড় ছেলেটি বড় তুখোড়, রেডিয়োটা ছুঁড়ে মারতেই সে ছোকরা সামনের চারতলা বাড়িটার কার্ণিসে উঠে বসে রইলো, কিছুতেই ধরতে পারলাম না।'

আর অধিক বর্ণনার প্রয়োজন হলো না, ভদ্রলোক বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

গাড়ি ঠেলা

গাড়ি দেখে বোঝা কঠিন। কবেকার কি গাড়ি, একেকবার একেক অংশ পাল্টাতে পাল্টাতে অবশেষে এই আকার ধারণ করেছে।

'কি গাড়ি আপনার ?'

'আজ্ঞে, মরিস মেজর।'

'মরিস মেজর ?' প্রশ্নকর্তা যেন একটু বিচলিত বোধ করলেন। তারপর বললেন, 'মরিস মাইনর শুনেছি, কিন্তু মেজর ?'

'মরিস মাইনর ঠিকই শুনেছেন, এটাও আগে তার ছিলো।' উত্তরদাতার কণ্ঠস্বর রীতিমত বিনীত শোনালো।

'আগে মাইনর ছিলো এখন মেজর হয়ে গেছে।

'তাতে আর আশ্চর্যের কি রয়েছে, মিলিটারির বাইরে সব জায়গাতেই একুশ বৎসর পূর্ণ হলে মেজর হয়। আমি পর্যন্ত মেজর হয়ে গেছি, দুবার ভোট দিলাম। এ সেই যুদ্ধের আগের গাড়ি মশায়, আমার অন্নপ্রাশনে মামার বাড়ি থেকে দিয়েছিলো, ত্রিশ বছর হয়ে গেলো আর কতদিন মাইনর থাকবে।'

এই অদ্বিতীয় মরিস মেজর গাড়িটি সম্প্রতি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে;

গাড়ির মালিক কি সব ভেবেচিন্তে কোথায় চলে যাবে ঠিক করে অমন গাড়িটা বেচে দিলো।

বড় ভালো গাড়ি ছিলো। এখানকার পাঁচ লিটার, অর্থাৎ পুরানো এক গ্যালন তেলে একশো পঁচিশ মাইল যেতো। এর মধ্যে অবশ্য পনেরো মাইল তেলে আর একশো দশ মাইল ঠেলে। আর সেই একশো দশ মাইল ঠেলার মধ্যে অধিকাংশে সময়েই একশো মাইল মতো ঠেলতে হতো আমাকে। তবে বড়ো হাল্কা ছিলো গাড়িটা, একেবারে পাখির মতো, ঠেলতে একটুও কষ্ট হতো না।

আর তা ছাড়া বহুবার নানা দফায় ঠেলে ঠেলে আমি সহজে ঠেলার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলাম। মরিস মেজর গাড়ি হয়তো এদেশে আর কারো নেই, তবে কলকাতায় এখন আবার বর্ষা নেমেছে, রাস্তায় রাস্তায় জল জমছে, আবার গাড়ি-ঠেলার সিজন এলো, কারো কারো প্রয়োজনে লাগতে পারে ভেবে আমি গাড়ি ঠেলার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছি। স্কুল ফাইন্যাল টেস্ট পেপারে ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকার জ্যামিতিক সহজ প্রক্রিয়া দেয়া থাকে, প্রথম দেখতে সেই প্রক্রিয়া যত গোলমেলে মনে হয় আসলে তেমন কিছু নয়, এই নিয়মাবলী প্রসঙ্গেও সেই বক্তব্য।

গাড়ি ঠেলিবার সহজ নিয়মাবলী ঃ

(প্রথমেই ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আরো কেউ আছেন, এই কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়াই এই নিয়মাবলী প্রস্তুত। একা থাকিলে ভাড়াটে লোক সংগ্রহ করিয়া গাড়ি ঠেলাইবেন, ইহাই অভিপ্রেত।)

১। গাড়ির চালক ডানদিকের সামনের জানলা দিয়া স্টিয়ারিং-এ হাত রাখিবেন অপর হাতে রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিবেন। তাঁহাকে আর কিছুই করিতে হবে না।

২। এইবার গাড়ি ঠেলিবার সমস্ত দায়িত্ব দ্বিতীয় ব্যক্তির। তিনি গাড়ির পিছনে বাঁ দিকে আসিয়া দাঁড়াইবেন। ডান হাত গাড়ির ছাদে এবং বাম হাত গাড়ির মাডগার্ডে স্থাপনা করিয়া দুই পা ছয় ইঞ্চি ব্যবধান

রাখিতে হবে, সম্মুখে ডান পা এবং বাম পা পশ্চাতে রাখিয়া ডান হাঁটু ৪৫° কোণ করিয়া বাঁকাইতে হইবে, এইভাবে বাঁকাইয়া হাঁটু দ্বারা, বাম হাত এবং ডান হাত দ্বারা একই সঙ্গে চাপ প্রয়োগ করা সম্ভব।

৩। প্রতিবার চাপ প্রয়োগ করিবার পূর্বে সম্পূর্ণ পাকস্থলী উজাড় করতঃ সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, দুই কাঁধ সঙ্কুচিত করিয়া কাঁধ. কান ও গলা একত্রীভূত করা প্রয়োজন, ইহাতে ঘন ঘন দম গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। ডান হাঁটু দ্বারা যে মুহূর্তে চাপ প্রয়োগ করা হইবে সেই মুহূর্তে বাম হাঁটু উরুর সহিত লম্বাকারে আনিয়া রাস্তার সমান্তরাল করিয়া ধরিতে হইবে। এইরূপ পর পর তিন বা অধিক বার (শারীরিক স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী) করিয়া যখন কোনো ফল পাওয়া যাইবে না, তখন গাড়ির ডান দিকে যাইতে হইবে। ডান দিকেও ঠেলিবার প্রক্রিয়া একই রূপ হইবে, শুধু ডান হাঁটু, ডান হাত ইত্যাদির স্থলে বাম হাঁটু বাম হাত এবং বিপরীতক্রমে বামের পরিবর্তে ডান প্রত্যঙ্গ-সমূহের ব্যবহার করিতে হইবে।

৪। এইরূপ কয়েকবার করিবার পর শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হইয়া থাকিবে, মনে হইবে দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত সময় ধরিয়া অবশ্য সম্মুখের ব্যক্তি বাম হাতে আলগোছে স্টিয়ারিং ধরিয়া, ডান হাতের রুমাল দিয়া কপালের স্বেদ মার্জনা করিতে থাকিবেন, স্বভাবতই দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্রোধ ও উষ্মা হইতে থাকিবে। এইবার তিনি বাম হাঁটু মাটিতে স্থাপনা করিয়া নিচু হইয়া বসিয়া ডান দিকের টিউব হইতে হাওয়া ছাড়িয়া দিবেন। হাওয়ার শব্দ হইলেও প্রথম ব্যক্তির সন্দেহ না হইয়াই স্বাভাবিক কারণ তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি এত নিঃশ্বাস পরিতাগ করিয়াছেন তাঁহার ইহাও নিঃশ্বাসত্যাগের শব্দ বলিয়া ভ্রম হইবে। অনুরূপভাবে বাম দিকে সরিয়া আসিয়া ডান হাঁটু ভূমিতে স্থাপনা করিয়া বাম দিকের টিউব শূন্যে করা যাইবে। অতঃপর নিঃশব্দে গাড়ির পিছনে হইতে সরিয়া যাইতে আর কোনো কষ্ট নাই। সরিয়া যাইবার পথে পুলিশ কিংবা মোটর এসোসিয়েশনকে ফোন করিয়া যাওয়া চলিতে পারে।

লড়াই

কয়েকদিন আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি নিঃশব্দে সংগ্রামের আমি দৈবাৎ প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছি। সংগ্রামের পটভূমি একটি মিনিবাস।

সবাই জানেন, কিছুদিন হলো মিনি বাস ঠিক কি এর সামাজিক এবং আইনগত মর্যাদা কি এটা বাস না ট্যাক্সি এই নিয়ে জটিল বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই কলহ, মিনিবাসে ধূমপান করা উচিত কি উচিত নয়, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু মিনিবাসে উগ্র ধূমপায়ীরা এবং তাদের উগ্র বিরোধীরা ক্রমশ যে রকম পরস্পরের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠছেন, তাতে এই বিবাদ শীঘ্রই আদালতের কাঠাগড়া পর্যন্ত পৌঁছাবে এ বিষয়ে আমার ক্ষীণতম সন্দেহ নেই।

এই রকম একটি বিবাদের আমি নীরব-সাক্ষী, আর কেউ সম্পূর্ণ ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করতে পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বিবদমান যাত্রীদ্বয়ের পাশেই আমি বসেছিলাম বলে আমি সেই নীরব সংগ্রামের সবটুকু দেখতে পেয়েছি।

মিনিবাস আসছিলো ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে গড়িয়াহাট। মিনি-বাসের সবচেয়ে পেছনের সিটে পাঁচজন বসতে পারে। এই পাঁচজনের মধ্যস্থলে আমি বসেছিলাম। আমার ডানদিকে এক ভদ্রলোক, বছর পঞ্চাশ বয়েস হবে, রোগা লম্বামতন ভদ্রলোক একটা লম্বা ফিল্টার রাজা সিগারেট পকেটে থেকে বার করে খুব আরাম করে ধরিয়েছেন আর মধ্যে মধ্যে তাঁর ডানদিকের সহযাত্রী যিনি জানলাম ধারে বাস আছেন তাঁকে বক্রচোখে নিরীক্ষণ করছেন।

ধূমপায়ী ভদ্রলোকের বক্রদৃষ্টি অনুসরণ করে জানলার ধারের ভদ্রলোককে দেখলাম অত্যন্ত বিরক্তভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

এই দ্বিতীয় ভদ্রলোক এঁর পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকটি সমবয়সী; ঐ পঞ্চাশের মতই বয়স হবে, তবে একটু হৃষ্ট-পুষ্ট। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইনিও কখনো কখনো বক্রদৃষ্টিতে তাঁর সহযাত্রীকে দেখছেন এবং এঁর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ধূমপান বিশেষত মিনিবাসে ধূমপান ইনি মোটেই অনুমোদন করেন না।

এঁদের দুজনের চোখে ঘোরালো দৃষ্টি দেখে, আমি অনায়াসে অনুমান করে নিলাম, এখনই প্রচণ্ড কলহ শুরু হবে। আমার কেমন যেন এ-ও মনে হলো যে এঁরা দুজনে পরস্পর পরিচিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সে রকম কিছু হলো না। আমি বাইরের দিকে চলমান জগৎ-সংসার দেখতে লাগলাম। হঠাৎ মিনিট-দুই পরে একটা আচমকা জাপটা-জাপটির শব্দ আমার ডানদিকে। অন্যান্য সহযাত্রীর সঙ্গে আমিও চমকিয়ে তাকালাম। কিন্তু সেই জাপটা-জাপটি কেন হলো, কোথায় হলো, কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। আমার পাশের দুইজন গম্ভীর নির্বিকার মুখে স্থির হয়ে বসে রয়েছেন।

কেউই কিছু বুঝতে পারলেন না কিন্তু আমি একটু বুঝলাম। কারণ, আমার পাশের সেই ধূমপায়ী ভদ্রলোকের মুখে জ্বলন্ত সিগারেটটি আর নেই অর্থাৎ তাঁর মুখের সিগারেটটি জানলার ধারের ভদ্রলোক একটি আকস্মিক টানে ছিনিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

উপরের ঘটনাটি ঘটলো পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের কাছে। এরপর সব আবার স্বাভাবিক। হঠাৎ গুরুসদয় দত্ত রোডের মুখে আবার সেই জাপটা-জাপটির শব্দ। এবার আমি পাশে ছিলাম বলেই আর কেউ না দেখে থাকুন আমি স্পষ্ট দেখলাম সেই ধূমপায়ী ভদ্রলোক নীরবে জানলার ধারের ভদ্রলোকের একটা কান আচ্ছা করে মুলে দিলেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে এই অপমান ও যন্ত্রণা সহ্য করলেন। সবাই যখন তাঁদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে দুজনেই নির্বিকার। কারোর বোঝার উপায় নেই কিছুক্ষণ আগে কি সাংঘাতিক অথচ নিঃশব্দ দ্বন্দ্বযুদ্ধ এঁদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

এর পরের ঘটনা ঘটলো একেবারে গড়িয়াহাট রোডের মোড়ে। এবার

অবশ্য বহুলোকের চোখের সামনে। সিগারেটখোর ভদ্রলোক যিনি একটু আগে কান মূলে দিয়েছিলেন তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন তাঁর পিছনে পিছনে গুটি গুটি আসার পর একটু আগের নির্যাতিত দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি এবার তাঁর প্রতিশোধের পালা, এবং সত্যি সত্যি প্রতিশোধ নিলেন তিনি একটু বেশি, নির্মম ভাবে।

অল্পবয়েসী ছেলেরা যে রকম করে প্রায় সেই রকম, সামনের ভদ্রলোক যেই সিঁড়ির উপরে পা বাড়িয়ে দিয়েছেন, পিছন দিক থেকে দ্বিতীয় ভদ্রলোক চকিতে নিজের একটা পা বাড়িয়ে ল্যাং মেরে ফেলে দিলেন তাঁকে। সামনের হতভাগ্য ভদ্রলোক এতক্ষণ খুবই সতর্ক ছিলেন, কিন্তু এইরকম আক্রমণ কিনি কল্পনা করতে পারেন নি! তিনি কলাগাছের মত গাড়ির সিঁড়ি থেকে হাতের ব্যাগ-ছাতা সমেত মুখ থুবড়ে ফুটপাথের উপর পড়ে গেলেন। সবাই হায়-হায় করতে লাগলেন। শুধু যিনি পড়ে গেলেন ভাব-চিহ্নহীন তাঁর মুখ, আর যিনি ঠেলে দিলেন তিনিও নির্বিকার ভাবে জনতার পাশ কাটিয়ে মোড়ের দিকে এগোলেন।

এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে আর একজন মধ্যবয়সী মানুষ সজ্ঞানে পায়ে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছেন এই কথাটা বুঝবার আগেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমিও গড়িয়াহাট মোড়েই নামি। দু-একটা টুকিটাকি বাজার ছিলো, সেটা সেরে মিনিট পনেরো পরে বাড়ির দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটু আগের অধঃপতিত ভদ্রলোক একটা সিগারেটের দোকান আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমার কেমন সন্দেহ হলো, ভদ্রলোককে বুঝতে না দিয়ে আমিও একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়লাম, দেখবার জন্যে কি হয়।

কি আর হবে? একটু পরেই সেই জানলার ধারের দ্বিতীয় ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত চিত্তে এবং হৃষ্ট মনেই মনে হলো এগিয়ে এলেন এই দিক দিয়ে এবং সিগারেটের দোকানের আড়াল থেকে প্রথমজন বেরিয়ে এসে পিছন থেকে ধাঁ করে ছাতা দিয়ে এক বাড়ি। এবং আবার জনতার বিস্ময়, প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় নির্বিকার বাকশূন্য। পরস্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দুজনে মুহূর্তের মধ্যে দুদিকে চলে গেলেন।

অফিস

আমার অফিসে ঢুকবার তিনদিনের মধ্যে বন্ধু এসে বড়বাবুকে অনুরোধ করেছিলেন টেবিল সরাতে পিকক ড্যান্স নাচবার জায়গার বন্দোবস্ত করার জন্যে। তবুও আমার চাকরি যায়নি।

অবশ্য এ চাকরি যদি যাওয়ার হতো তবে অনেক আগেই যেতে পারতো, যেদিন যোগদান করেছিলাম কাজে সেইদিনই যাওয়ার কথা ছিলো! কিন্তু তা যায়নি।

এর আগে মফঃস্বলে কাজ করতাম এক শিক্ষায়তনে। সেখান থেকে কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছিলো না, আমার এ অফিস যতো তাগাদা দেয় আমাকে তাড়াতড়ি কাছে যোগদান করার জন্যে, আমার পুরানো শিক্ষায়তন ততই আটকিয়ে দেয়। অবশেষে দুই প্রান্তে যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করে একটা দিন কোনোরকমে স্থির করা গেলো।

এ অফিসে বলে গেলাম, আমি তাহলে অমুক তারিখে আসছি, তবে আসতে একটু দেরী হবে। আর সেখানে আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কিছু টাকা জমে রয়েছে যদি আসার দিন না নিয়ে আসি পরে নিয়ে আসতে খুবই অসুবিধা হবে।

আমার এ অফিস একটু আমতা আমতা করেই রাজি হয়ে গেলেন, 'ঠিক আছে, ঐ প্রথমদিন একটু লেটেই আসবেন।'

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা হাতে পেতে পেতে বেলা সাড়ে বারোটা হয়ে গেলো। আমার সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে ছিলো। ট্রেনে আসতে শেয়ালদা পৌঁছাতে প্রায় দু'ঘণ্টার ধাক্কা, তাও অনেক পরে পরে ট্রেন। আমার এর পরের ট্রেন ছিলো সোয়া দুটোর সময়। সেটা সোয়া চারটেয় এসে শেয়ালদায় পৌঁছানোর কথা কিন্তু পৌঁছালো আরো আধঘণ্টা লেটে। তার মানে পৌনে পাঁচটায়। তারপর

ট্রেন থেকে নেমে আর ভাববার অবসর নেই। মফঃস্বল থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে আসছি, সঙ্গে হ্যারিকেন, কুঁজো, সতরঞ্চি মোড়া বিছানা, কালো ট্রাঙ্ক, স্বল্পকালীন আবাসের জন্যে যা যা কিনেছিলাম কিছুই ফেলে আসিনি।

ভেবেছিলাম এই সমস্ত জিনিস কালীঘাটে আমার বাসায় রেখে এসে তারপর অফিসে যাবো। কিন্তু এখন আর হাতে সময় কোথায়, পাঁচটা বাজতে চললো। যথাকালে একটি ট্যাক্সি সংগ্রহ করে তাতে মালপত্র উঠিয়ে নিলুম, তারপর সোজা এসে নামলুম আমার অফিসের সামনে।

এখন সমস্যা হলো এই মালপত্র কোথায় রেখে যাই, কার জিম্মায়? কিছুই ঠিক করতে না পেরে একটা ঝাঁকামুটে রাস্তা থেকে সংগ্রহ করে ফেললুম। তার মাথায় আমার জিনিসপত্র চাপিয়ে দিয়ে অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

তখন পাঁচটা বেজে দু'এক মিনিট হয়ে গেছে। সবাই বেরোচ্ছে অফিস থেকে আর আমি বাক্স-বিছানা-ছাতা-লণ্ঠন নিয়ে অফিসে প্রবেশ করছি। নিশ্চয়ই খুব বিচিত্র দৃশ্য, সবাই খুব অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

সোজা প্রধান কর্তার যাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলুম তাঁর ঘরে ঢুকে গেলুম। হাফডোরের বাইরে ঝাঁকামুটে অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রধান কর্তা আমাকে দেখে বললেন, 'তাহলে আপনি এসে গেছেন, কেমন লাগলো আজকের কাজ?' তিনি বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন আমি আগে কোনো সময়ে দুপুর নাগাদ জয়েন করেছি, এখন ছুটির সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি।

সুতরাং তাঁকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করতে হলো, 'আমি স্যার কিছুতেই আগে আসতে পারলাম না, এই মিনিট পাঁচেক লেট হয়ে গেলো, এই এই-মাত্রই এলাম।'

শুনে ভদ্রলোক তাজ্জব, 'একে আপনি পাঁচ মিনিট লেট বলছেন। পাঁচ মিনিট লেট হয় দশটা পাঁচে পাঁচটা পাঁচে নয়। আমি আজ পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করছি এরকম কোথাও কখনো শুনিনি।' ভদ্রলোক একটু থেমে নিলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আজকেই তো আপনার জয়েন করার লাস্ট ডেট ছিলো?' আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে যথেষ্ট হয়েছে, আপনি জয়েন করতে পারেননি, আর তাই আপনার চাকরি খতম, মানে চাকরি এখানে হলো না।' ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে টেবিল গোছাতে লাগলেন বোধহয় অফিস ছাড়বার প্রস্তুতি হিসেবে। আমি কি বলবো ভেবে হাত কচলাচ্ছি, হঠাৎ ঝাঁকামুটেটি আর অপেক্ষা করতে রাজি নয় বলে হাফডোর ক্রশ করে ঘরের মধ্যে ঢোকে।

বাক্স-বিছানা ইত্যাদি দেখে আঁৎকে উঠলেন প্রধান কর্তা, 'এগুলো কার, এগুলো কি?' তিনি আমাকেই উত্তরদাতা জেনে প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে, আমার বাক্স-বিছানা।' আমার বিনীত উত্তরে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, 'মানে এই অফিসে থাকবেন মনস্থ করে এসেছেন নাকি?'

সব বুঝিয়ে তাঁর উত্তেজনা প্রশমন করে সেদিন রাত্রিতে চাকরি রক্ষা করে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত নটা। কিন্তু আমার বাক্স-বিছানা নিয়ে বেরোতে পারলাম না। ঢোকবার সময় কিছু বলেনি কিন্তু বেরনোর সময় দারোয়ান কেয়ারটেকারের বিনানুমতিতে ওগুলো নিয়ে বেরোতে দিলো না। কেয়ারটেকারের অনুমতি আজো মেলেনি। অফিসের সদর দরজার একপাশে আমার বাক্স-বিছানা সাড়ে চার বছর পড়ে ছিলো।

খেলার ছলে

অনেকদিন পরে আবার এই সেদিন ষষ্ঠিচরণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আমাদের পাড়ার মোড়ে, এইমাত্র ষষ্ঠিচরণকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলাম, এর আগে প্রতিবার বসা অবস্থায় দেখেছিলাম। দেখলাম হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে পারেন না একদম, দাঁড়িয়ে কথাবার্তা চালাতে হয়। তবে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় কাঁধে একেবারে ঝাঁকিটাকি দেন না, ঠোঁটটা অবশ্য কাঁপে।

দেখলুম ষষ্ঠিচরণও ব্যাপারটা জানেন, আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি নতুন বিয়ে করেছেন শুনলাম ?'

নতুন বিয়ে কথাটা আমার খুব ভালো লাগলো না কিন্তু কথা না বাড়িয়ে বিনীত এবং লজ্জিত ভাবে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম।

'তা ওয়াইফ্ কেমন হলো ?' ষষ্ঠিচরণের প্রশ্নটা সামান্য এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'অসামান্য।'

আমার উত্তরে ষষ্ঠিচরণ বিশেষ খুশি হলেন বলে মনে হলো না। বিশেষ করে তাঁর একটা জিজ্ঞাসায় খুব ঘাবড়ে গেলাম, 'আপনি কি আমার ওয়াইফ্‌কে কখনো দেখেছেন ?'

আমি জানালুম, 'না সে সৌভাগ্য হয়নি আমার।' ষষ্ঠিচরণ তখন বললেন, 'তাহলে আর ওয়াইফ্ দেখলেন কি ? জানেন আমার ওয়াইফ্ কখনো মাছ কুটতে, তরকারী কুটতে হাতের আঙুল-টাঙুল কেটে গেলে কিছুতেই আয়োডিন, ডেটল কিছু লাগান না, স্রেফ একটু পান খাওয়ার চুন লাগিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, ঘা-টা কিছু হয় না।'

একটু থেমে ষষ্ঠিচরণ কি যেন ভেবে আবার বললেন, 'আচ্ছা, আপনার শ্বশুরবাড়িতে কেউ শিকার-টিকার করতে পারে ?'

নিজের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে শ্বশুরালয়ে আর কাউকে ঠিক শিকারী-টিকারী বলে মনে হয়নি, কাজেই লজ্জিত ভাবে বললাম, 'কই, তেমন তো মনে হলো না।'

'এই দেখুন', ষষ্ঠিচরণকে প্রবল উল্লসিত দেখালো, যেন রাজ্যজয় হয়ে গেলো এইভাবে বললেন, 'শিকার করা কি সোজা কথা ! শিকার করতেন আমার মামাশ্বশুরমশায়। জয়রামপুর-হিতৈষীতে তাঁর মারা পাগলা শেয়ালের ছবি বেরিয়েছিলো, কলকাতার কাগজেও ছবি পাঠিয়ে ছিলেন ছাপবার জন্যে, কিন্তু সম্পাদকরা পাগলা শেয়ালের ছবি ছাপতে সাহসই পেলে না, বিশেষ করে তখন কলকাতায় যা গরম।'

'আমার বড়মামাশ্বশুর মেডেল পেয়েছিলেন বড়সাহেবের কাছে শিকার করার জন্যে। বড়সাহেবের তিব্বতী কুকুর, এই লোম, এই কানের লতি (হাত দিয়ে দেখালেন ষষ্ঠিচরণ)। নাম দিয়েছিলেন চুঁয়াচো। সেটা

হঠাৎ একদিন ক্ষেপে গেলো। বড়সাহেবের নতুন মেম এসে সেদিনই জানলা-দরজার পর্দা পাল্টিয়েছিলো। সে তো আর জানতো না কুকুরটা নীল রং দেখলে ক্ষেপে যায়। সব পর্দা নীল রংয়ের। কুকুরটা ক্ষেপে গিয়ে প্রথমেই একটা পর্দা কামড়ে ছিঁড়ে ফেললো, তারপরে গুড-লাক লেখা একটা পাপোশ। খাঁটি বিলিতি পাপোশ, সেই আমলের এ্যাণ্ডারসনের দোকানের। বড়সাহেব এই খবর পেয়ে মামাশ্বশুরকে সঙ্গে করে অফিস থেকে ছুটে এলেন।' দম নেওয়ার জন্যে একটু থামলেন ষষ্ঠিচরণ, পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর আবার শুরু করলেন, 'ততক্ষণে চুঁয়াচো একেবারে ক্ষেপে গেছে। একটা ড্রেসিং-টেবিলের ওপরে উঠে দেওয়াল-ঘড়িটা কামড়ানোর চেষ্টা করছে। বড়সাহেবকে দেখেই লাগালো এক ছুট সোজা বাইরের লনে। বড়সাহেব আমার মামাশ্বশুরকে বললেন, 'ইসকো মার ডালো, গুপালবাবু।' মামা-শ্বশুর সঙ্গে সঙ্গে দোনলা বন্দুক নিয়ে বারান্দায় গিয়ে কুকুরটাকে গুলি করলেন। কুকুরটা ছুটছে, থামছে, মামাশ্বশুরও গুলি করছেন। বারো রাউণ্ড গুলি করলেন। একটা গুলিও লাগলো না।' এইখানে ষষ্ঠিচরণ গর্বিতভাবে আমার দিকে তাকালেন, হাতের সিগারেটটায় বেশ দুটো জোরে টান দিয়ে আবার শুরু করলেন, 'ততক্ষণে বড়সাহেব নীল পর্দাগুলো দেখতে পেয়েছেন, তাড়াতাড়ি পর্দাগুলো খুলে ফেললেন। নীল পর্দা দেখলে তাঁরও ভীষণ মাথা ঘোরে। আর পর্দাগুলো খুলে ফেলামাত্র চুঁয়াচো একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। লেজ নাড়তে নাড়তে বড়সাহেবের কাছে ছুটে এসে পা চাটতে লাগলো। বড়সাহেব তো ভীষণ খুশি। সঙ্গে সঙ্গে দেরাজ খুলে একটা সোনার মোহর বের করে মেডেল করে পরিয়ে দিলেন মামাশ্বশুরের গলায়। দিয়ে বললেন, 'গুপাল, তুম চুঁয়াচোকো লাইফ সেভ কিয়া, তুম বড়া শিকারী আছে।'

ষষ্ঠিচরণ হাঁটা শুরু করলেন, শুধু একবার পিছনে ফিরে আমাকে বললেন, 'আমার ওয়াইফের নাকে দেখবেন, সেই মোহর ভেঙে তার মেজোমামী সাতটা নাকছাবি বানিয়েছিলো, তারই একটা দিয়েছিলো। এখন আমার ওয়াইফের নাকে আছে।'

আবার কুকুর

মিসেস নবরূপা হালদারের বাড়িতে অনেককেই অনেক প্রয়োজনে যেতে হয়, কেউ যান কবিতার বইয়ের জন্য সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে, কেউ চাকরীর উমেদারিতে আর কেউ বা গভীরতর কোনো প্রয়োজনে। আমাকেও যেতে হয়েছিলো, গিয়েছিলাম ঠিক বিশেষ কোনো প্রয়োজনে নয়, চায়ের নিমন্ত্রণে।

আমার ধারণা হয়েছিলো মিসেস হালদার সম্ভবত আমাকে ছাড়াও আরো কাউকে কাউকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সাধারণত এই রকম ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিশিষ্ট ব্যক্তির ওখানে নিমন্ত্রণ থাকলে আমি নির্দিষ্ট গৃহের কাছাকাছি পদচারণা করতে থাকি যতক্ষণ না পরিচিত কারোর কঙ্গে দেখা হয়ে যায় তখন যূথবদ্ধ হয়ে নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রবেশ করি।

আজ কিন্তু মিসেস হালদারের বাড়ির সামনের ফুটপাথে বহুক্ষণ পায়চারি করেও কোন লাভ হলো না, আর যাদের নিমন্ত্রণ আছে যদি অবশ্য তেমন সৌভাগ্য আর কারো হয়ে থাকে তারা হয় আগে এসে গেছে, না হয় আসবে না। ঘড়ি দেখলাম সন্ধ্যা সাতটায় আসার কথা, এখন সাতটা বেজে দশ মিনিট হতে চললো, এর চেয়ে বেশি দেরি করা অভদ্রতা হবে।

গুটি গুটি বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। মিসেস হালদার যতটা খ্যাতিমতী ততটা বিত্তশালী নন। কলকাতার উপকণ্ঠে ছোট একতলা বাড়ি। গেটে দারোয়ান বা পাহারাওলা বলতে কিছু নেই। ঠিক গেটও নয়, বাইরের ঘর আর রাস্তার মধ্যে হাত-চারেক জমি বেড়া দিয়ে ঘেরা, নিঃসঙ্কোচেই এবং নির্ভয়েই ঐ চারহাত ভূমি অতিক্রম করছিলাম হঠাৎ বাইরের ঘরের দরজার ওপরে নজরে এলো একটি বহুপরিচিত ঘোষণা, ঠিক কলিংবেলের বোতামের নিচেই।

বাঙলা, ইংরেজি, হিন্দী তিন ভাষায় লেখা,

'কুকুর হইতে সাবধান'

'Beware of dog'

এবং হিন্দীতে 'হুঁশিয়ার কুত্তা হ্যায়' সাইন বোর্ড লাগানো পাশে বোধহয় নিরক্ষরদের সুবিধার্থেই একটি অতি হিংস্র কুকুরের ছবি আঁকা, আমি অবশ্য লিখতে-পড়তে একেবারে জানি না তা নয় কিন্তু লিখিত অনুশাসনের চেয়ে চিত্রিত ভয়াবহতাই আমার পক্ষে মারাত্মক।

অতি শৈশবকালে দুটো নেড়িকুকুর ভীষণ কলহ করে আমার অতি প্রিয় একটা এক নম্বর ফুটবল ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলো, তারো কিছুকাল পরে আমাদের পাঠশালার দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রবল মহিমান্বিত অশ্বিনীমাস্টারকে যখন কুকুরে কামড়িয়ে এক মাস শয্যাশায়ী করে রেখেছিল, তখন থেকেই কুকুরের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন। লোকে কোথাও বাড়ি-ভাড়া করতে গেলে বা রাত্রিবাস করতে গেলে প্রশ্ন করে, 'ওখানে মশা কি রকম?' আমি প্রশ্ন করি, 'ওখানে কুকুর কি রকম?'

তবু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। আর আমার জীবনে যেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানেই বাঘের ভয়। যত কুকুরের হাতের (অর্থাৎ সামনের দুটো পা) থেকে পালিয়ে বেরিয়েছি তত বেশি করে কুকুরের পাল্লায় পড়েছি। মাসতিনেক আগে একটা আনুমানিক যোগ করে দেখেছি যে আমি জীবনে সাতাশি মাইল রাস্তা কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়েছি। এই সাতাশি মাইলের মধ্যে অর্ধেকের বেশি কাঁচা রাস্তা, বুনো ঝোপঝাড়, কাঁদা-জঙ্গল, একবার দুই দিকের তারকাঁটার বেড়ার মধ্যে এক ফুট স্পেসে ছুটেছিলাম প্রায় আধ মাইল। পিচের রাস্তা বা ভালো বাঁধানো রাস্তায় দৌড়ানোর সৌভাগ্য খুব কমই হয়েছে। কুকুরের তাড়াও এক ভিসাস্ সার্কল—যাকে বলে বিষাক্ত বৃত্ত। দৌড়লেই কুকুর তাড়া করবে আর তাড়া যদি করে কুকুর তাহলে দৌড়তেই হবে। তার মানেই পথের চারপাশের আর দশটি কুকুরকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করা।

জীবনের আমি একশো দশ ঘণ্টা পানাপুকুরে ডোবার মধ্যে কাটিয়েছি কুকুরের তাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার অভিজ্ঞতা এই রকম যে সাধারণত

পৌনে চার ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা যে ডোবার পাড়ে বৃথা পরিশ্রম না করে আক্রমণকারী কুকুর সরে যায় তারো অর্ধঘণ্টাখানেক পরে নিঃশব্দে ডোবা বা পুকুর পরিত্যাগ করতে পারলে পুনরায় কোন তুর্ঘটনার ভয় থাকে না।

গাছে উঠতে পারলে অবশ্য সবচেয়ে সুবিধে হয়। যে কোনো কারণেই হোক কুকুরেরা গাছের নিচে এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করে না। কিন্তু হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে গাছ পাওয়া যায় না সব সময়। আর সব সময় ওঠাও যায় না। তবে বিপদের সময় আরোহণ বা পরবর্তী অবতরণেও অসুবিধা বা অসম্ভাব্যতার কথা কে আর বিবেচনা করে। একবার এক ক্ষীণ টগর ফুলগাছে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আমি ডাল ভেঙ্গে আক্রমণকারী কুকুরের পিঠে পড়ে যাই। ঐ একবার ছাড়া আর কখনো কোনো কুকুরকে জব্দ করতে পারিনি। অমন সন্ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করতে করতে যে এক মিনিট আগে ভয়ঙ্কর তুঃস্বপ্ন অন্তর্হিত হতে পারে সে আমার কল্পনারও অতীত।

কুকুরের আক্রমণে সবসুদ্ধ গাছে কাটিয়েছি ত্রিশ ঘণ্টা। অপরিচিত-পরিচিত গৃহের ভিতরে বা ছাদে উঠে গেছি অসংখ্য বার। রাস্তার ধারে পার্ক করানো গাড়ির ছাদে তুবার, একবার এক আইসক্রিমওয়ালার বাক্সের ওপরে। তাও তার ওপরে দাঁড়ানো খুব কঠিন খুব ব্যালান্স দরকার। আর ঐ অবস্থায় বিহ্বল আইসক্রিমওয়ালার প্রতিবাদ আর মারমুখী কুকুরের থাবা, ঐ অবস্থায় ব্যালান্স।

মারামারি

এ গল্প নিশ্চয়ই অনেকে শুনেছেন, এমনো কেউ কেউ হয়তো পাঠকদের মধ্যে আছেন, যাঁরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হননি।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভয়ঙ্কর গালাগাল করছে, সে একেবারে যাচ্ছেতাই ভাষায়। যে গালাগাল খাচ্ছিলো সে হঠাৎ ভীষণ ক্ষেপে গেলো।

'কি বললি, থাপ্পড় মারবি ? মেরে ছ্যাখতো থাপ্পড়।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি কালব্যয় না করে বিনা দ্বিধায় এক চড় কষালো।

'কি চড় মারলি, ঘুষি মারতে পারবি ?' প্রথম ব্যক্তি চড় খেয়ে আরো চটে গেলো।

বিনা বাক্যব্যয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির ঘুষি নিক্ষেপ, ঘুষি খেয়ে প্রথম ব্যক্তির মাথাটা একটু ঝিমঝিম করে উঠলো, একটু সামলে নিয়ে আবার সেই আগের মতন,

'ঘুষি পর্যন্ত মারলি, আচ্ছা, ঘুষি মেরে নাক দিয়ে রক্ত বার করতে পারবি ?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ব্যক্তির নাকে পরপর হুটো ঘুষি লাগালো এবং সত্যিই রক্ত বেরুলো।

প্রথম ব্যক্তি এবার যেন একেবারে সত্যিই ক্ষেপে গেলে, ধুতির খুঁট দিয়ে নাকের রক্ত মুছতে মুছতে বললো,

'তবে রে, লাথি মারতে পারবি, দেখি তোর কত সাহস, লাথি মেরে চিৎ করে ফেলে দিতে পারবি ?'

প্রথম ব্যক্তির দিক থেকে এত উত্তেজনার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেননা সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় ব্যক্তি লাথি লাগালো, পর পর তিনটে লাথি। প্রথম ব্যক্তি একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো, কিন্তু তবু থামলো না, গোঙাতে গোঙাতে বললো,

'দেখি তোর ক্ষমতা, ছোরা মারতো দেখি।'

এবার কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি আর এগুলো না, কেননা সে ইতিমধ্যেই বহুদূর এগিয়ে গেছে, এর উপরে ছোরা মারলে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত, নানা গোলমালের ভয় আছে। তাছাড়া তার এত মারধোরের ইচ্ছাই ছিলো না, শুধু বিপক্ষের গোঁয়াতুর্মির জন্যে। সুতরাং সে ধীরেসুস্থে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করলো। এখন প্রথম ব্যক্তিকে পায় কে, সে মাটিতে গড়াতে-গড়াতে, গোঙাতে-গোঙাতে চেঁচাতে লাগলো,

'ব্যাটা হেরে গেলি, ব্যাটা ছোরা মারতে পারলি না, ব্যাটা হেরে গেলি।'

এরকম হেরে যাওয়ার সৌভাগ্য জীবনে স্বল্প লোকেরই জোটে। তবু কলহ প্রতিনিয়ত হয়, সর্বত্র হয়। বাড়িতে, অফিসে, আদালতে, রাস্তায়, ঘাটে, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে. স্টিমারে, শৈশবে, যৌবনে, বার্ধক্যে, হাসপাতালে, অপারেশন টেবিলে, মৃত্যুশয্যায়, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, আলোয়, অন্ধকারে, দিনে, রাত্রে, সর্বত্র, সর্বদা। সর্বদা চতুর্দিকে মারামারি হচ্ছে। মারামারি করবার, মারামারি থামাবার. মারামারি লাগাবার, মারামারি দেখবার।

মারামারি প্রধানত দুই প্রকারের, আকস্মিক এবং পরিকল্পিত।

(ক) আকস্মিক—অধিকাংশ মারামারিই আকস্মিক। ট্রেনে দু'জন সহযাত্রীর মধ্যে জানলা খুলে রাখা কিংবা বন্ধ করে রাখা নিয়ে যে মারামারি, তাকে আমরা আদর্শ আকস্মিক মারামারি বলতে পারি। এই ধরণের মারামারি বহু ক্ষেত্রে অসমজাতীয়। সকলের সঙ্গে দুর্বলের বৃদ্ধের সঙ্গে যুবকের, তরুণীর সঙ্গে বালকের। ক্রোধ, আত্মসম্মান ইত্যাদি কারণে কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় এই রকম মারামারি ঘটে। এর ফল ভালো হয় না।

জনসাধারণ এবং সরকারের উচিত এই ধরণের মারামারি ঘটতে না দেয়া।

(খ) পরিকল্পিত—পরিকল্পিত মারামারি বলতে বোঝায় দু'জন বা দু'দল লোক পরস্পর আক্রোশবশতঃ প্রস্তুত (কিংবা কখনো অপ্রস্তুত) অবস্থায় যে মারামারিতে লিপ্ত হয়। সহপাঠী, সহকর্মীদের মধ্যে এই ধরণের মারামারি হয়। বিধানসভায় বা কর্পোরেশনে বা পুরাকালে জমিদারের চর দখল করা নিয়ে যে খুনোখুনি, সেটা এই গোত্রীয়। এখানে সম-অসমের প্রশ্ন নেই। কেননা, দু'পক্ষই মারামারি করবে মনস্থির করে ফেলেছে।

পরিকল্পিত মারামারি থামানোর চেষ্টা না করাই ভালো। থামিয়েও লাভ নেই; আজ থামুক কাল হবে।

উপসংহারে মারামারি পর্যায়ের একটি অতুলনীয় গল্প শুধু যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্যে,

হঠাৎ রাস্তায় এক ব্যক্তির উপর একদল লোক চড়াও হলো;

আজ তোকে পেয়েছি প্রাণকেষ্ট, আজ তোকে শেষ করে ছাড়বো।' এই বলে দমাদম পিটতে লাগলো।

লোকটা বিনা আপত্তিতে সমস্ত মার হজম করলো, তারপর ক্লান্ত হয়ে হানাদারেরা চলে গেলে একটু একটু হাসতে লাগলো।

এত মার খেয়েও লোকটাকে হাসতে দেখে পথচারীদের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। তাদেরই একজন প্রশ্ন করলো,

'কি ব্যাপার, এত মার খেয়েও হাসছো ?'

'আরে মশায়, আমার নাম বলরাম, ওরা তো মারলো প্রাণকেষ্টকে। প্রাণকেষ্ট আমার ভয়ঙ্কর শত্রু।' বলরাম হো-হো করে হাসতে লাগলো।

বৃষ্টি

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

কয়েক দিন ধরেই বর্ষা আসবে আসবে করছিলো কিন্তু সত্যিই যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে কেউই ভাবতে পারেন নি। যাঁরা এতদিন গরমে শুকিয়ে উঠেছিলেন এইবার তাঁদের জলে ভরাডুবি হবে।

এসবই খুব চিন্তার কথা। কিন্তু সবচেয়ে চিন্তায় পড়েছেন 'বৃহত্তম কলিকাতা গর্ত খনন পর্ষদ।' পর্ষদ ধরে নিয়েছিলেন বর্ষা যথারীতি ১লা আষাঢ় অর্থাৎ ১৫ জুন নাগাদ সুরু হবে। বহু হিসেব করে তাঁরা প্রোগ্রাম নিয়েছিলেন বৃহত্তর কলকাতায় বর্ষার আগেই ষাট হাজার চারশো গর্ত খুঁড়বেন। সেই অনুযায়ী তাঁরা সরকার থেকে অনুমোদন নিয়েছিলেন এবং অর্থের বরাদ্দ পেয়েছিলেন।

কিন্তু যথাসময়ের আগে বর্ষা শুরু হওয়ায় পর্ষদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে। তাঁরা সর্বসমেত মাত্র সাতচল্লিশ হাজার গর্ত এখন পর্যন্ত খুঁড়ে উঠতে পেয়েছেন, এর মধ্যেও আবার হাজার দেড়েক গর্ত,

সেগুলো ছয়-সাত মাস আগে গত শীতের সময় খোঁড়া হয়েছিল সেগুলি এতদিন খোলা অবস্থায় পড়ে থেকে নানা প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক কারণে ধূলো-কাদায় একা একাই প্রায় বুজে এসেছে। অবশ্য বর্ষা যদি এরকম শত্রুতা না করতো তাহলে নিশ্চয়ই টার্গেট ছুঁতে পারতেন পর্ষদ। শেষ কয়েক দিন রাত দিন খেটে, এর মধ্যে পুরনো গর্তগুলি যেগুলি বুজে এসেছে, সেই হাজার দেড়েক, তারো প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যেতো।

পর্ষদের নিজস্ব কোন কর্মচারীবাহিনী নেই। এ বিষয়ে তাঁরা মূলতঃ নির্ভর করেন তাঁদের বিশেষ অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত পৌরসংস্থা, টেলিফোন, বিদ্যুৎ কর্পোরেশন এবং অতি সম্প্রতিকালে সুখ্যাত এবং দিগ্বিজয়ী কয়েকটি উন্নয়ন অধিকারের উপরে। সুখের কথা, সর্বক্ষেত্রে, অকর্মণ্যতার এই প্রচণ্ড দুর্দিনেও গর্ত খনন পর্ষদকে তাঁর সহযোগী সংস্থাগুলি একেবারেই নিরাশ করেন নি। প্রত্যেক গলির প্রবেশ ও প্রস্থান পথে দুটি করে আবশ্যিক গর্ত, প্রতি চৌমাথায় বা তার নিকটে এক বা একাধিক দশ ফুট গভীর বাইশ ফুট চওড়া নালা খুঁড়ে ফেলবার নিম্নতম শর্ত এঁরা যৌথভাবে পালন করেছেন।

তবুও বর্ষা এসে গেছে, এখনো প্রায় সাড়ে তেরো হাজার গর্ত বাকি। তাই প্রথম বৃষ্টির ধাক্কাতেই খনন পর্ষদের উচ্চপর্যায় পরামর্শদাতা কমিটি একটি বিশেষ সভায় মিলিত হয়েছিলেন।

কমিটির সদস্য সংখ্যা সতেরো, দুঃখের বিষয়, এঁরা সবাই আসতে পারেননি। সভার আগের দিন শেষ রাত্রিতে প্রবল বৃষ্টিতে সমস্ত গর্ত ডুবে যাওয়ায়, সতেরো জনের মধ্যে যে ছয়জন সাঁতার জানেন না তাঁরা স্বখাত সলিলে ডুবে যাওয়ার ভয়ে সভায় আসার সাহস পান নি। দু'জন সদস্য যদিও সাঁতার জানেন. কিন্তু জলে সাঁতরানো আর দশ হাত গভীর কাদায় সাঁতরানো এক জিনিস নয়, তাঁদের একজন শ্যামবাজার পাঁচ মাথায় আরেকজন ঢাকুরিয়ায় ব্রিজের নিচে বিরাট দুটো গর্তে আটকে পড়েন। তাঁদের উদ্ধার করতে দু'দিক থেকে দু'টি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিলো, সেই গাড়ি দুটি তাঁদের ঠিক আগের গর্ত দুটিতে আটকে যায়, এবং অবশেষে দুটি পুলিশের গাড়ি কেন তাঁরা আসতে পারছেন না

অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের গর্তের সামনের গর্তগুলোতে বন্দী হয়ে পড়ে।

যা হোক, এর পরেও বাকি সদস্যদের উপস্থিতিতে গর্ত খনন পর্ষদের পরামর্শদাতা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

বলা বাহুল্য, বৃহত্তর কলকাতায় গর্ত খনন পর্ষদের এই উচ্চপর্যায় কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য মাইনিং-এঞ্জিনীয়ার। মাটির নিচে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে এঁদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা। এছাড়া একজন আছেন, যাঁকে বহু অনুরোধ করে বিদেশ থেকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয়েছে ইনি ভেনিসে খাল সংস্কার বোর্ডের অবৈতনিক শিক্ষানবীশ ছিলেন দশ বছর, পরে সুয়েজ এবং পানামা এই দুটি খালের চারপাশে দু'বছর করে মোট চার বছর যথেষ্ট যত্নসহকারে সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

অনুমান করি, পাঠক-পাঠিকারা এই কৃতবিদ্য সদস্যদের যোগ্যতা বর্ণনায় ক্লান্ত বোধ করছেন। বরং সেই গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী থেকে কিছু উদ্ধৃত করতে পারলে হয়তো তাঁদের পছন্দ হতে পারে।

প্রায় অর্ধ দিবস ব্যাপ্ত সেই সুদীর্ঘ সভায় পূর্ণ বিবরণ (টাইপ করা ৩৭৫ পৃষ্ঠা) আমাদের প্রয়োজন নেই, সব বোঝার ক্ষমতাও আমাদের নেই শুধু দুটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত উল্লেখ করলেই চলবে।

প্রথম সিদ্ধান্ত অতিশয় গোপনে কিন্তু জনস্বার্থে আমি প্রকাশ করে দিচ্ছি। অত্যন্ত নিচুগলায় প্রথমে ইংরেজিতে পরে বাংলায় দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয়েছে সরকারকে কিছুতেই জানানো হবে না বা বুঝতে দেওয়া হবে না যে খনন পর্ষদ তাঁদের ষাট হাজার চারশো গর্তের নির্ধারিত এবং প্রতিশ্রুত কোটা পূরণ করতে পারেন নি। জলে সমস্ত গর্ত ডুবে আছে এবং আশ্বিনের আগে কলকাতার রাস্তায় জল পুরোপুরিভাবে নেমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, সুতরাং জলের নিচে কত গর্ত আছে কেউ জানতে পারবে না, গুনতেও পারবে না, সাতচল্লিশ হাজার না ষাট হাজার কে ধরবে?

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো জল থাকতে থাকতেই জলের নিচে বাকি

গর্তগুলি খুঁড়ে ফেলা। যদি সাধারণ কুলীকামিনের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব না হয় তাহলে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল থেকে বেশি খরচ দিয়ে এই ধরনের কাজের অভিজ্ঞ লোক নিয়ে আসা হবে, তারা পুরুষানুক্রমে কাদা-জলে কাজ করে অভ্যস্ত।

বড়োদের জন্য ডোডো তাতাই

বাইরের ঘরে তাতাইবাবুর বাবা আর মা দু'জনে বসে আছেন। দু'জনের থেকে নিরাপদ দূরত্বে জানলার ধারে বসে তাতাইবাবু আখ চিবোচ্ছেন। একটি আখের ছিবড়ে যেন ঘরের ভেতর না পড়ে, তাতাইবাবুর মা আপন মনে তাস নিয়ে পেসেন্স খেলতে খেলতে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তাতাইবাবুর-ও সেটা খেয়াল আছে, তিনি যথাসাধ্য চুষে যতদূরে সম্ভব শুষ্ক ছিবড়েগুলি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে যাচ্ছেন। ঘরের মধ্যে প্রকৃত পরিশ্রম করছেন তৃতীয় ব্যক্তি, তাতাইবাবুর বাবা। আজ শনিবার, সকাল সকাল তিনি অফিস থেকে এসে জামাকাপড় ছেড়ে তাতাইবাবুর হোমওয়ার্ক করতে বসেছেন। তাঁর একটা সুবিধে আছে, তাঁর হাতের লেখা প্রায় তাতাইবাবুর মতই তিনি নিজের হাতে কষলেও তাতাইবাবুর টিচারেরা সেটা ধরতে পারেন না। তবে আজকাল, নতুন ধরণের লেখাপড়া, ভদ্রলোক সব টাস্ক বুঝতে পারেন না। করতেও পারেন না; সেগুলো বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেও তাতাইবাবুকেই করতে হয়। আজ বোধহয় ভদ্রলোকের মাথা একটু খুলেছে, তাতাইবাবুকে বিশেষ দরকার পড়ছে না তাঁর, সাহায্য ছাড়াই তিনি হোমটাস্কগুলো টুকটুক করে কষে যাচ্ছেন।

অবস্থা ভালো বুঝে, তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে ডেকে এনে বাড়ির মধ্যের উঠোনে খেলতে চলে গেলেন। খেলা আর কিছুই নয়, বল ড্রপা-ড্রপি খেলা। কে কতক্ষণ ধরে একটা রবারের বল ড্রপ দিতে পারে।

প্রথম দফায় ডোডোবাবু দিলেন তিয়াত্তর ড্রপ, উত্তরে তাতাইবাবুর আটান্ন। তার পরের বার ডোডোবাবুর নিরবচ্ছিন্ন একশো সাত, এবার অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে তাতাইবাবু বল হাতে নিয়ে ড্রপ দিতে প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু বল ড্রপ শুরু করতে গিয়েই তার একটা কেমন খটকা লাগলো। বাইরের ঘর থেকে হাসি গল্পের আওয়াজ আওয়াজ আসছে, বাবা কথা বলছেন, মা হাসছেন।

তাতাইবাবুকে থেমে যেতে দেখে ডোডোবাবু বললেন, 'কি হলো?' তাতাইবাবু বললেন, 'শুনছেন না, বাইরের ঘরে কে এলো, দেখে আসি?' ডোডোবাবু কিঞ্চিৎ কর্ণপাত করে বললেন, কই বাইরের ঘরে কেউ আছে বলেতো মনে হচ্ছে না। আপনার বাবার গলার স্বরই শুনছি আর আপনার মা হাসছেন।' তাতাইবাবু বললেন, 'বাইরের লোক নিশ্চয় কেউ আছে। না হলে, বাবার কথা শুনে মা হাসবে, এ কখনো হতেই পারে না।'

তাতাইবাবু অবশ্য আর বাইরের ঘরে অনুসন্ধান করতে গেলেন না। বল ড্রপ দিতে দিতে চিন্তা করতে লাগলেন, বাইরের লোকটা কখন উঠবে কি জানি, বাবা হোমটাস্কটা শেষ করে রাখতে পারবে তো?